সোপান।

প্রথম স্তর।

(নীতি-বিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ)

'শরৎচন্দ্র' 'বিরাজমোহন' ও 'সন্ন্যাসী' প্রণেতা
কর্ত্তৃক বিরচিত।

"I call that mind free which sets no bounds to its love, which is not imprisoned in itself or in a sect, which recognizes in all human beings the image of God and the rights of his children, which delights in virtue and sympathizes with suffering wherever they are seen, which conquers pride, anger, and sloth, and offers itself up a willing victim to the cause of mankind."

"Without God our existence has no support, our life no aim, our improvements no permanence, our best labours no sure and enduring results, our spiritual weakness no power to lean upon, and our noblest aspirations and desires no pledge of being realized in a better state."

W. E. Channing. D. D.

কলিকাতা।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীভুবনমোহন ঘোষ
দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কার্ত্তিক ১২৮৬।

উৎসর্গ।

পরম প্রীতির আস্পদ শ্রীমতী অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়।

শ্রদ্ধেয়া ভগ্নি,

আপনি আমার যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিতে সক্ষমা হইয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিবার আমার আর কোন উপায় নাই। আপনার মানসিক সৌন্দর্য্যের নিকট আমি আত্ম বিক্রয় করিয়াছি। আপনার প্রতিভা, আপনার প্রখর বুদ্ধি, আপনার সুতীক্ষ্ণ বিবেচনা শক্তি, আপনার জ্ঞান ও শিক্ষা, আপনার অহঙ্কার শূন্য আত্মাকে এই খলতাময় সংসারে এক অলৌকিক সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিয়াছে। আমাদিগের দেশের যে সকল মহিলাগণ এইক্ষণ শিক্ষা পাইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ ২ সংসারের পূতিগন্ধযুক্ত অহঙ্কারের নিকট আত্ম বিক্রয় করিয়া উন্নতির পথে কণ্টক রোপণ করিতেছেন। সেই সকল মহিলাগণের আচরণে আমি সর্ব্বদাই হৃদয়ে আঘাত পাইয়া থাকি; কিন্তু যখন আপনার বিনয়াবনত ও শান্ত মূর্ত্তি স্মরণ পড়ে, তখন এদেশকে বিশেষ গৌরবান্বিত মনে করি। এই বঙ্গদেশের রমণীগণের মধ্যে আপনাকে সৃষ্টির এক আশ্চর্য্য রচনা বলিয়া বুঝিয়াছি। সংসার আপনাকে জানুক বা না জানুক, আপনার অস্তিত্বে এদেশের গৌরব শত গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে হইলে, এই বলিতে পারি;—আমি আপ-

নার হৃদয়কে ভালবাসি,—আপনার প্রতিভাকে পূজা করি, আপনার বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তির সম্মান করি ;—আর আপনার পবিত্র আত্মাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করি। কিন্তু এ সকল প্রকাশ করিবার আর কোন উপায় নাই ;—আমি দরিদ্র,—মূর্খ,—জ্ঞানহীন ;—বুদ্ধি হীন। পৃথিবীতে যে ধনের কাঙ্গাল আমি ;—সে ধন আমার মিলিল না ;—ঈশ্বরকে জানিলাম না ;—ধর্ম্মকে বুঝিলাম না। আর কি বলিব ;—যাহা আমার শিক্ষা করা উচিত ছিল,—এইক্ষণস্থায়ী জীবনে তাহার কিছুই হইল না ; অগাধ সলিলে ডুবিয়া কূল কিনারা কিছুই পাই না। ভগ্নি, সমদুঃখিনী আপনি ; তাই আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। আমার উপহার কেবল অভাব প্রকাশক মাত্র, কিন্তু হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশক নহে। কি করিব, ইহাই গ্রহণ করুন। 'সোপান' প্রথম স্তর আপনার নামে উৎসর্গ করিলাম।

কলিকাতা, পটলডাঙ্গা
কার্ত্তিক, ১২৮৬।

আপনার একমাত্র স্নেহ-ভিকারী,
শ্রীদেঃ—
শরৎচন্দ্র প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা।

নিবেদন।

সোপান—প্রথম স্তর প্রকাশিত হইল, ইহার অধিকাংশ প্রবন্ধই ইতিপূর্ব্বে ‘ভারত-সুহৃদ’ ও ‘সমালোচক’ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল; সেই সকল পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া ইহাকে জনসাধারণ সমীপে উপস্থিত করিলাম।

সোপান মুদ্রিত করিবার পূর্ব্বে দুইটী চিন্তা আমাদের মনে সর্ব্বদাই জাগরিত ছিল। একটী চিন্তা এই,—রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতিকে কেন আমরা এক স্থানে দেখিতে পাই না। অনেকে বলিয়া গিয়াছেন, ইহা চিরকাল বিচ্ছিন্ন রহিয়াছে, চিরকাল থাকিবে; আমরা কিন্তু তাহা বিশ্বাস করি না। আমরা বিশ্বাস করি,—ভারতে এই তিনটীর মিলনে যে বল সৃজিত হইবে, তাহাই এদেশের ভবিষ্য-উন্নতির মূলভিত্তি স্বরূপ শোভা পাইবে। সোপানে তজ্জন্য আমরা নীতি সম্বন্ধে কোন তারতম্য রাখিলাম না;—ইহাতে যথাসাধ্য রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির সমাবেশ করিয়াছি। দ্বিতীয় চিন্তার বিষয় এই;—আমাদিগের এ উদ্যম কি ফল প্রসব করিবে? অর্থাৎ এদেশের লোক কি একই সময়ে এই ত্রিবিধ নীতির আদর করিতে পারিবে? ইহা ভাবিয়া আমরা কূল পাইলাম না,—কিন্তু তথাপি বিড়ম্বনার জাল বিস্তৃত করিলাম!! যদি ইহাতে ভাল ফল হয়, দেশের প্রতি আমাদের আশা শতগুণে বর্দ্ধিত হইবে।

সোপান সম্বন্ধে পাঠকগণের নিকট আমাদের একটী অনুরোধ;—ইহা পাঠ করিবার সময় মনে রাখিবেন, ইহাতে কেবল ব্যক্তিবিশেষের মত। আমরা সর্ব্বসাধারণের মত রক্ষা করিতে চেষ্টা পাই নাই। আমাদের মতের সহিত যতদূর ঐক্য হইবে, ততটুক গ্রহণ করিবেন, অন্য অংশ পরিত্যাগ করিবেন। আমাদিগের মতে ভ্রম থাকিতে পারে না, এ কথা আমরা বিশ্বাস করি না; আমাদিগের মত সম্বন্ধে যদি কেহ ভ্রম প্রদর্শন করেন, বিনীত মস্তকে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইব।

‘আমাদিগের অভাব’ এই প্রবন্ধে ‘সতীত্ব’ বিষয়ে মিলের যে মত সংগৃহীত হইয়াছে, সে মত তিন বৎসর পূর্ব্বে কোন স্থান হইতে সংগৃহীত

হইয়াছিল আমাদের স্মরণ নাই ; মিলের মত সম্বন্ধে যদি আমরা ভুল করিয়া থাকি, পাঠকগণ আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া ভুল প্রদর্শন করিলে কৃতজ্ঞ হইব।

দেশের একটী প্রধান সভা সম্বন্ধে আমাদিগের মত গোপন রাখিতে সমর্থ হই নাই, তজ্জন্য পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন। যাহার অস্তিত্ব দেশের উপকারের জন্য, তাহার সামান্য অপরাধও আমরা ক্ষমা করিতে পারি না। ব্যক্তিবিশেষের নিজের সম্পত্তি এবং সাধারণের সম্পত্তিকে আমরা দুই ভিন্ন নয়নে দেখিয়া থাকি :—ব্যক্তিবিশেষের সহস্র সহস্র অপরাধ আমরা ক্ষমা করিয়া লইতে পারি, কিন্তু সাধারণের যাহা, তাহার সামান্য অপরাধ মনে করিলেও আমাদিগের হৃদকম্প উপস্থিত হয়।

'বিলাতে স্থায়ী প্রতিনিধি' প্রবন্ধে আমরা অনেক স্থানে 'শিক্ষিত সম্প্রদায়' ব্যবহার করিয়াছি ; পাঠকগণ মনে রাখিবেন সে কেবল 'ইংরাজি ভাষায় শিক্ষিত শ্রেণী।' ভারত-সভার কার্য্যাদি ইংরাজি ভাষায় হয় হউক, কিন্তু অন্ততঃ জাতীয় ভাষায় তাহার অনুবাদ থাকা প্রয়োজন।

আমরা একটী কথা ভুলিয়া গিয়াছি ;—আমরা প্রবন্ধ রচনা সম্বন্ধে কাহারও সমকক্ষ হইতে ইচ্ছান্বিত হই নাই। বঙ্গদেশে অধুনা একটী প্রবন্ধ লেখক আছেন,—যাহার প্রতিভাকে আমরা পূজা করি, লিপি-কৌশলকে প্রশংসা করি, এবং চিন্তা শক্তিকে বঙ্গপ্রদেশের আদর্শ মনে করি ; কেহ মনে করিবেন না, পূর্ব্ববাঙ্গলার সেই মহাত্মার সমকক্ষ হইতে আমরা ইচ্ছান্বিত হইয়াছি। কিন্তু আমরা কল্পনা অপেক্ষা কার্য্যের অধিক পক্ষপাতী ;—আমরা জীবনের অধিক পক্ষপাতী। ভাল কথা শুনি বা না শুনি, ভাল জীবন পাইলে আমরা কৃতার্থ মনে করি। এদেশে যদি কিছুর অভাব থাকে, তবে তাহা ভাল জীবনের। এ দেশের যে প্রকার দুরবস্থা, জীবন সম্বন্ধে সকলকে পশ্চাৎবর্ত্তী করিয়া আমাদের অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করে। সোপান যদি একটী জীবনকেও প্রস্তুত করিতে পারে, তাহা হইলেই আমাদিগের বাসনা পূর্ণ হইবে ; পরিশ্রম সার্থক হইবে।

কার্ত্তিক, ১২৮৬।

বিনয়াবনত
'শ্রীদেঃ—
শরৎচন্দ্র প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা।

সূচীপত্র।

	বিষয়।	কোন পত্রিকা হইতে পুনর্মুদ্রিত	পৃষ্ঠা
১।	প্রকৃতির সুন্দর ছবি এবং মানবের স্বার্থ	(সমালোচক)	১
২।	প্রকৃত বীরত্ব ...	ঐ	২
৩।	কর্ত্তব্যের অনুরোধ ...	ঐ	৫
৪।	জাতীয় সাহিত্য এবং ধর্ম্মনীতি	ঐ	৮
৫।	জাতীয় জীবন এবং ভারতের দুর্ভিক্ষ	ঐ	১১
৬।	মানব জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য	ঐ	১৫
৭।	সত্য না ভালবাসা ? ...	ঐ	১৯
৮।	জীবনের সহিত মুখ বিনিসৃত বাক্যের সম্বন্ধ	ঐ	২৩
৯।	দুইটী অসমঞ্জস চিত্র ...	ঐ	২৫
১০।	মানবের উৎকৃষ্ট ভূষণ এবং অপকৃষ্ট আভরণ	ঐ	২৮
১১।	নীরব অভিনয় ...	ঐ	৩৩
১২।	এসংসারে মৃত কে ?	ঐ	৩৬
১৩।	ন্যায়ের সূক্ষ্ম পথ ...	ঐ	৩৮
১৪।	বাঙ্গালীর জীবন এত অনুন্নত কেন ?	ঐ	৪১
১৫।	শিক্ষা ...	ঐ	৪৩
১৬।	আন্দোলন ও কার্য্যে পরিণতি	ঐ	৪৮
১৭।	কে পরাধীন অথবা পরমুখাপেক্ষী ?	ঐ	৫০
১৮।	ভারত সভার পরিণাম	ঐ	৫৪
১৯।	ভারত সভা ও বিলাতে স্থায়ী প্রতিনিধি	নূতন	৫৬
২০।	বাণিজ্য ...	(১২৮৩ সালের ভারত সুহৃদ)	৬৪
২১।	দিল্লীর রাজসূয় যজ্ঞ	ঐ	৭৭
২২।	আমাদিগের অভাব ...	ঐ	৮৩
২৩।	স্ত্রী স্বাধীনতা ...	নূতন	৯৭

সোপান।

(নীতি বিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ)

প্রকৃতির সুন্দর ছবি এবং মানবের স্বার্থ।

এই বৈচিত্রময় জগৎ সংসারে মানব সুন্দর পদার্থের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে অক্ষম। যেখানে সৌন্দর্য্য, সেইখানেই ভালবাসা, সেইখানেই মনাকর্ষণ, সেইখানেই আত্মবিসর্জ্জন যেমন স্বাভাবিক, সেই প্রকার যেখানে সৌন্দর্য্য সেইখানেই প্রতিগ্রহণের ইচ্ছা, সেইখানেই আসক্তি এবং সেইখানেই স্বার্থ। স্বার্থ মানব হৃদয়ের সর্ব্বাপেক্ষা আদরের ধন এবং অতি ঘৃণিত বৃত্তি। সুতরাং সৌন্দর্য্যের সহিত মানব হৃদয়ের যে স্বার্থের সম্বন্ধ, তাহাও অত্যন্ত ঘৃণিত, এবিষয়ে মত বৈষম্য থাকিতে পারে না। পৃথিবীতে সুন্দর পদার্থের কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা থাকিতে পারে না, কারণ রুচী ও শিক্ষার তারতম্যে ভিন্ন ভিন্ন মানবের নিকট ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সুন্দর বলিয়া বোধ হইতে পারে; কিন্তু ইহা ঠিক কথা, যাঁহার নিকট যে পদার্থ সুন্দর, সেই পদার্থেই তাঁহার মন আকৃষ্ট, এবং সেই পদার্থেই তাঁহার হৃদয় আসক্ত। এসকল প্রকৃতির রোগগ্রস্ত আত্মার অস্বাভাবিক ফল কি না, তাহা আমরা বিচার করিতে ইচ্ছুক নহি; কিন্তু আমরা বিষণ্ণ হইয়া গিয়াছি,—সংসারের সৌন্দর্য্যের সহিত মানবের স্বার্থের সম্বন্ধের শেষ ফল দেখিয়া। প্রস্ফুটিত সুগন্ধযুক্ত কুসুমের ঘ্রাণে জগৎ মোহিত, নয়ন তৃপ্ত হয়, ইহা ত স্বাভাবিক ক্রিয়া, স্রষ্টার অলৌকিক মহত্ব বিস্তারের চিত্র; কিন্তু ঐ সৌন্দর্য্য, ঐ ঘ্রাণের অপব্যবহারের ফল নিশ্চয় অস্বাভাবিক কার্য্য এবং ঐ কুসুমকে হস্ত পেষিত হইতে দেখিলে আমরা নিশ্চয় বলিব, স্বার্থের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘৃণিত। ফুল ফুটিয়া শুকাইয়া যায় বলিয়া মানব করের তাহা স্পর্শ করিবার অধিকার কি, আমরা জানি না। সুন্দর পদার্থ দেখিলে মন মোহিত হইয়া স্রষ্টার প্রতি অনুরক্ত হইবে, ইহা ভিন্ন আর

সৌন্দর্য্যময় সৃষ্ট বস্তুর অস্তিত্বের আবশ্যকতা কি? কি হইতে পারে? সুগভীর রজনীতে সুস্নিগ্ধ চন্দ্র রশ্মিতে যাঁহারা নিবিষ্ট মনে ক্ষণকাল বিচরণ করিয়াছেন, তাঁহারা বাস্তবিকই অনুভব করিতে পারেন যে, সুন্দর পদার্থের সহিত মানবের স্বার্থের কোন সম্বন্ধ নাই; তবে যে জগতে এক প্রকার সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অস্বাভাবিক। আমরা চিরকাল বলিব যে,—ইন্দ্রিয়ের সহিত রিপুর সম্বন্ধ, মানবের শিক্ষা ও অভ্যাসের দোষেই এত ঘৃণিত আকার ধারণ করিয়া, সংসারকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। বসন্তে কোকিলের স্বর শুনিয়া, মলয়ানিল সেবন করিয়া, কিম্বা সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে বিচরণ করিয়া, সুগন্ধযুক্ত পুষ্পের ঘ্রাণ পাইয়া যাঁহারা রিপুর উত্তেজিত অবস্থা অনুভব করিয়া থাকেন, আমরা বলি তাঁহারা নিশ্চয় বিষম রোগগ্রস্ত। ক্ষুধার সহিত মানবের আহারের সম্বন্ধ, না সুন্দর খাদ্য সামগ্রী নিরীক্ষণের সহিত আহারের সম্বন্ধ, ইহা যাঁহারা চিন্তা করিয়া মীমাংসা করিতে পারিবেন, তাঁহারাই আমাদের কথার যাথার্থ্য অনুমান করিতে সমর্থ হইবেন। সংসারের মানব প্রকৃতিই বিষম রোগ গ্রস্ত; কাজেই আমরা বলি মানব সুন্দর পদার্থের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে অক্ষম। যেখানে সৌন্দর্য্য সেখানে পবিত্র ভাবের পরিবর্ত্তে এইক্ষণ স্বার্থের ভাব আসিয়া সম্বন্ধকে অত্যন্ত জঘন্য করিয়া তুলিয়াছে। আমরা সংসারের এই প্রকার দুর্গতি দেখিয়া দিন রাত্রি বিষণ্ণ ভাবে সেই দিনের প্রতীক্ষা করিতেছি, যেদিন সৌন্দর্য্যের সহিত মানবের স্বার্থের সম্বন্ধ চলিয়া যাইবে, যে দিন প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্যেই মানব ঈশ্বরের হস্ত দেখিয়া মোহিত হইয়া যাইবেন। ঈশ্বরই জানেন, সে সুখের অধিকারী আমরা কতদিনে হইব!!

প্রকৃত বীরত্ব।

যদি এই দুর্ব্বল, চিরনিদ্রাপ্রিয়, নির্জীব ভারতবাসীগণের হৃদয়ের এক-কোণে উৎসাহের শিখা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিতেছে, ইহা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে এখনই তাঁহাদিগের ভাবী পদশ্চারণের পথ নির্ণয় করিয়া রাখা আবশ্যক। আমরা জানি না মন্ত্র পরিগ্রহণের সময় ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াছে কি না; সংকল্প গ্রহণ করত অন্তরে সংযম ব্রত দ্বারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইবার সময় ভারতে আসিয়াছে কি না; তাহা আমরা নির্ণয় করিতে অক্ষম। এইক্ষণ যে প্রকার প্রবাহ চলিয়া যাইতেছে, ভবিষ্যতে এই প্রবাহ হইতে রত্ন প্রসূত হইয়া ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিবে কি না, তাহাও আমরা জানি না; না জানিলেও—আমাদের অন্তরে অনেক আশার স্বপ্ন বিরাজ করিতেছে। আমাদের সে সকল স্বপ্ন যে কাল্পনিক মৃগ-তৃষ্ণিকার ন্যায় মরুভূমে নিপতিত পথিক যে আমরা—আমাদিগকে প্রবঞ্চনা করিতে পারে না, তাহাও আমরা বলি না। আমাদের আশার মূলে কল্পনা আছে, স্মৃতি আছে, পক্ষপাতিত্ব দোষ আছে; এসকল সত্ত্বেও যখন আমরা মনুষ্য বলিয়া জগতে পরিজ্ঞাত হইয়া যাইতেছি, তখন আমাদের আশার মূলে যে কিছুই নাই, তাহাও কেহ বুঝাইতে পারিবেন না। আমরা বলি পূর্ব্বে যে বায়ু ভারতকে কেবল শীতল করিয়া বহিয়া যাইত, এইক্ষণ সে বায়ু কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, যে উদ্দেশ্যেই হউক বিদেশীয় জেতৃবর্গ ভারতের বায়ুকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছে। স্বার্থ সিদ্ধির উপায় আবিষ্কার করিতে যাইয়া ইংরাজেরা ভুলভ্রমে ভারতের উন্নতি সাধন করিয়াছে, এ কথা বলিয়া তাহাদিগের প্রতি অকৃতজ্ঞ হইতে চাও, হও, আমরা আপত্তি করি না, কিন্তু ইহা নিশ্চয় ভারতের পূর্ব্বের বায়ু এইক্ষণ আর নাই। দুর্ভিক্ষ পীড়নে ভারতের অস্থিমজ্জা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছে, তাহা ঠিক কথা; অন্নাভাবে কোটী কোটী লোক মরিয়া যাইতেছে ঠিক; কিন্তু ঐ মৃত্যু নহে, উহাতে জীবন আছে। ভারতের বায়ু এখন এত পরিশুদ্ধ হইয়াছে যে একজনের মৃত্যু আর একজনের জীবনে দ্বিগুণ জীবন সঞ্চার করে। ভারতের এই চিহ্ন যদি আমরা না দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে এত কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করিয়া আর এ কষ্টের জীবনতরী বাহিতাম না; এই সকল সুভ লক্ষণ দেখিয়া যদি আমাদের হৃদয় উৎসাহিত ও বলযুক্ত না হইত, নিশ্চয় বলিতেছি, এতদিন এ প্রাণ দেহ পরিত্যাগ করিত। আমাদের অন্তরে আশা আছে, তাই আমরা আজও আছি, অন্তরের গরল অন্তরে পোষণ করিয়াও দিনের পর দিন অবিচলিত ভাবে বিদায় করিয়া দিতেছি।

আজ আমরা যে বিষয়ের আলোচনা করিব, তাহার আবশ্যকতা বুঝাইতে যাইয়া আমরা এত সময় কাটাইলাম। এইক্ষণ দেখা যাউক, বাস্তবিক প্রকৃত বীরত্ব কি, এবং বীরত্বের আবশ্যকতা ভারতে আছে কি না। এজগতে এমন

দিন ছিল, যখন যোদ্ধা ভিন্ন আর কেহই বীরপদে অভিহিত হইতে পারিতেন না। যখন ইউরোপ ব্যাপিয়া মহা কোলাহল ধ্বনি উঠিয়াছিল, যখন সকল দেশ একজনের বাহুবলের নিকট অম্লান বদনে মস্তক অবনত করিতেছিল, তখন আমরা বুঝিয়াছিলাম,—নেপোলিয়নই প্রকৃত বীর। আমাদের দেশের পুরাকালে যাঁহারা বীর পদবীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও বাহুবলের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। বাহুবলই বীরের লক্ষণ, একথা জগতে এত অণুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, যে ইহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলাও অসম্ভব। আমরা বলি বাহুবলে যে বীরত্ব, তাহা অতি নীচ শ্রেণীর বীরত্ব ; এতকাল পর্য্যন্ত তাহা জগতে প্রচারিত হইয়া না থাকিলেও এমন সময় আগমন করিবে, যখন আমাদের কথার প্রত্যেক অক্ষর অমৃত বর্ষণ করিবে। বাহুবল পৃথিবীর অত্যন্ত নীচ শ্রেণীর বল, ধনবল অপেক্ষাও হেয়। সত্য বটে আজ পর্য্যন্তও এই প্রকার বলের নিকট দুর্ব্বল-মস্তক নত রহিয়াছে, কিন্তু আমরা বলি সে দুর্ব্বলতা শরীরের নহে, মনের। আমরা বলি নির্জীব শরীরেও মানব বীর হইতে পারে, যদি তাঁহার অন্তরে ধর্ম্মভাব থাকে, যদি সত্যের আদর, ন্যায়ের আদর, ও নীতির আদর তাঁহাকে উজ্জ্বল করে। এসংসারে সেই প্রকৃত বীর, যে শত সহস্র নির্যাতনেও আপন সত্যকে অবমাননা করে না; সেই প্রকৃত বীর, যে জীবন পরিত্যাগ করিয়াও আপন মত বজায় রাখিতে সক্ষম। ভারতবর্ষে যদি যুদ্ধের আয়োজন আরম্ভ হইয়া থাকে, তবে আমরা সেই প্রকার বীরের উত্থান দেখিতে চাই, যাঁহার শরীরের দুর্ব্বলতা মনের দুর্ব্বলতা নহে, যে আপন সত্যকে রক্ষা করিবার জন্য জীবন পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। পাশব বল প্রয়োগে যাহা হয়, তাহা পৃথিবীতে অনেক দেখিয়াছি। দেখিয়াছি—পাশব বলের নিকট চিরকাল দুর্ব্বল মানব নিপীড়িত হইয়া চরণে মর্দ্দিত হয়। ভারতে কি আবার সেই জয় প্রার্থনীয়, যাহাতে দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার অপ্রতিহত রহিবে? ভারতে কি এমন যুদ্ধের আয়োজন হইতেছে, যাহাতে এক জন অত্যাচারীকে সিংহাসন চ্যুত করাইয়া অন্য অত্যাচারীকে বসাইবে? যদি তাহা হয় তবে আমরা বলি, চাই না সে জয়, যাহাতে সকলের সমান অধিকার থাকিতে পারে না। সেই বীর চাই, যাঁহার দ্বারা ভারত সমাজের সকল প্রকার পাপ রাশি ধৌত হইতে পারে। যুদ্ধ কিসের জন্য? সুখের জন্য। যে দেশে সত্য নাই, যে দেশে ধর্ম্ম নাই, প্রেম নাই, নীতি নাই, ন্যায়

নাই, সে দেশে কি সুখ থাকিতে পারে? যে দেশে প্রেম নাই, সে দেশে কি একতা থাকিতে পারে? যে দেশে একতা নাই, সে দেশে কি সুখ থাকিতে পারে? যে দেশে একতা নাই, সে দেশের স্বাধীনতা ও অধীনতা; যে দেশে সকলের অধিকার সমান নহে, সে দেশ চিরকাল পরাধীন। ধর্ম্ম ভিন্ন কখনও স্বাধীনতা থাকিতে পারে না, যেখানে ধর্ম্ম নাই—সেখানে একাধিপত্য। এ সকল সার সত্য। যদি ভারতে ম্যাজিনীর ন্যায় কোন সত্য পরায়ণ বীরের উত্থান হয়, তাপিত বক্ষ শীতল করি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া। নচেৎ সিজর চাই না,—নিপোলিয়ন চাই না—আলেকজাণ্ডার চাই না—ডিউক অব ওয়েলিংটন চাই না। সেই প্রকৃত বীর, যে ঈশ্বরকে মধ্যস্থলে রাখিয়া, মানব জাতিকে চতুর্দ্দিকে একাসনে উপবেশন করাইয়া, আপনার কর্ত্তব্য পালনের জন্য, শত সহস্র নির্য্যাতনেও অটল থাকিতে পারে। যদি ভারতে যুদ্ধের প্রয়োজন হইয়া থাকে, সে যুদ্ধ অগ্রে সমাজের সহিত। যে প্রদেশের ঘরে ঘরে কাটাকাটী, যে দেশের সমাজনীতি অত্যন্ত জঘন্য, যে দেশের রমণীর প্রতি পুরুষের পশুর ন্যায় ব্যবহার, সে দেশে অন্য প্রকার যুদ্ধ আর কি হইবে? কি হইতে পারে? যে দিন ভারতের গৃহে গৃহে ম্যাজিনীর ন্যায় বীরের উত্থান দেখিব, সেই দিন বুঝিব, জয়লাভ এদেশে সহজ কথা। ঈশ্বর করুন যে পরিশুদ্ধ বায়ু এখন ভারতে পরিচালিত হইতেছে, এই বায়ুতে ভারতে কোটী কোটী সত্য পরায়ণ ধার্ম্মিক বীরের উত্থান হউক। ঈশ্বর করুন ম্যাজিনীর ন্যায় বীর এই জরাগ্রস্থ ভারতে আগমন করুক।

কর্ত্তব্যের অনুরোধ।

"More powerful upon me than any advice or any danger, were the exceeding grief and anxiety of my poor mother. Had it been possible for me to have yielded, I should have yielded to that."

Joseph Mazzini.

এই পৃথিবীতে এতকাল অবস্থিতি করিয়াও একটী সমস্যা আমরা পূরণ করিতে সমর্থ হইলাম না। মানব, অবস্থানুসারে যতই অলস হউক না কেন, কার্য্য না করিয়া থাকিতে পারে না। আমিও কার্য্য করি, তুমিও কর, রামাও

করে, শ্যামাও করে, কিন্তু আমরা কিজন্য কার্য্য করিয়া থাকি? বিদ্যালয়ের ছাত্র দিবা রাত্রি না মানিয়া কত পুস্তক স্মরণ শক্তিতে আবদ্ধ করিতে যত্নবান। শিক্ষক অনবরত ৪ ঘণ্টা ছাত্রের পাঠ লইয়া যুদ্ধে রত থাকেন। কেরাণী সকল সুখ ত্যাগ করিয়া মসি যুদ্ধকেই সার জ্ঞান করেন। আবার? লেখক কত চিন্তার তরঙ্গ ভেদ করিয়া কত ধন সঞ্চয় করেন। হিতৈষী কত পরিশ্রম করিয়া অন্যের উপকার করিতে রত থাকেন। এসকল কেন? কৃষক শস্য রোপন করে ফলের আশায়, কিন্তু সেই ফল না পাইলে কি তাহার মন বিচলিত হয় না?—হয় বিচলিত। আমরা প্রশস্ত মুখে বলি কেবল কৃষক কেন? বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধির আকর্ষণ না থাকিলে, আমাদের দেশের ছাত্রের সংখ্যা এক চতুর্থাংশ কমিয়া যাইত। শিক্ষকের অর্থের আশা না থাকিলে, তাহারা আর ঐ মহৎ ব্রত গ্রহণে ইচ্ছুক হইত না;—কেরাণী মহলের হাহাকারে দিক পূর্ণ হইত;—লেখক পুরস্কার না পাইলে এ দেশে আর পুস্তক প্রচারিত হইল না;—যশ মানের আশা না থাকিলে হিতৈষী নাম এদেশে কেহ পাইত না।

আমরা যে সমস্যা পুরণ করিতে পারি না, তাহা এই,—লোক সামান্য স্বার্থের আশায় কেন কার্য্যে রত হয়; কেন নৈরাশ্যে তাহাদিগের অন্তর কাঁপিয়া যায়; বিভীষিকায় কেন তাহারা পথ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে? আমরা আমাদিগের অপরিপক্ক জ্ঞানের দ্বারা যাহা বুঝিয়াছি, তাহা এই,—আমাদের দেশে কর্ত্তব্য জ্ঞান একেবারেই নাই। কর্ত্তব্য জ্ঞানের মহত্ত্ব আমাদের দেশের লোকেরা অদ্যাবধিও বুঝিতে সক্ষম হন নাই বলিয়াই, তাঁহাদিগের জীবন, ঘূর্ণায়মান বায়ুর ধূলির ন্যায় অস্থির ও অবলম্বনশূন্য হইয়া নৈরাশ্যে আত্ম-সমর্পণ করিয়াও কৃতার্থ হয়।

সৌভাগ্যবশতঃ আমরা এমন সময়ে জন্ম পরিগ্রহণ করিয়াছি, যখন আমরা অনেক কর্ত্তব্য পরায়ণ লোকের সহিত পরিচিত হইতেছি। অন্যান্য দেশের কথা আমরা উল্লেখ না করিলেও পারি। ইটালির যে সুপ্রসিদ্ধ মহাত্মার লেখা হইতে আমরা এই প্রবন্ধের উপরে কয়েক পুংক্তি গ্রহন করিয়াছি, এই মহাত্মা এক জন আদর্শ কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি। তাঁহার নাম অনন্ত কাল পর্য্যন্ত স্বর্ণাক্ষরে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে অঙ্কিত থাকিবে। এই যে নির্জীব দেশে আমরা বাস করিতেছি, এদেশেও আমরা একটী মহাত্মার নাম করিতে পারি, যিনি আপন কর্ত্তব্য পালনের সময়ে আপন পুত্রকে মৃত্যু শয্যায় শয়িত দেখিয়াও

আপন কার্য্য পরিত্যাগ করেন নাই। কর্ত্তব্য জ্ঞানের শক্তি, স্বার্থের ক্ষমতা হইতে সহস্র গুণে প্রবল। কর্ত্তব্যের অনুরোধের এমনি শক্তি যে, যতক্ষণ মানব আপন কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে না পারে, ততক্ষণ তাহার মন সুস্থ হয় না। কর্ত্তব্যের ভার লইয়া যখন তাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, তখন কাহারও সাধ্য নাই তাঁহাদিগকে ফিরাইতে পারে। সংসারের যশ মানের স্বপ্ন, অর্থের মহীয়সি শক্তি, লোকের ঘৃণা বা দ্বেষ, অসহ্য যাতনা, ইহার মধ্যে কেহই কর্ত্তব্য-পরায়ণ ব্যক্তিকে বিচলিত করিতে পারে না। তাঁহারা অধ্যয়ন করেন কেবল বিদ্যার জন্য, আপন কর্ত্তব্যের অনুরোধে; তাঁহারা পুত্রকে পালন করেন কেবল কর্ত্তব্য জ্ঞানে; তাহারা সংসারের সকল কার্য্য করেন, কেবল ঐ এক স্বার্থের জন্য,—কর্ত্তব্যের অনুরোধ। আমরা বলি যদি মানবের মানসিক শক্তি নিচয়ের মধ্যে এমন কোন গুণ থাকে, যাহাকে অন্যে পূজা করিতে পারে, তাহা এই কর্ত্তব্য জ্ঞান। এই কর্ত্তব্য জ্ঞানই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। যাঁহার অন্তরে ইহার শক্তি বিস্ফারিত, তিনিই প্রকৃত মনুষ্য।

কর্ত্তব্যের অনুরোধ সকলের এক প্রকার নহে, তাহা ঠিক কথা। সকল সময়ে আপন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করাও সহজ কথা নহে। বিবেক শিক্ষার দ্বারা উন্নীত না হইলে অনেককে অন্ধকারে লইয়া যায়, তাহাও ঠিক, অর্থাৎ বিবেক কুসংস্কারের দ্বারা মলিন হইলে সততই মানবকে অন্ধ করে।

শরীরের পক্ষে যেমন চক্ষু সহায়, মনের পক্ষে তেমনি বিবেক। কিন্তু ইহা যখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, তখন আর কে মানবকে ঠিক রাখিতে পারে? উপায় আছে। উপায়——অতীত মানবের সমস্বর। আমরা স্বীয় স্বীয় বিবেক দ্বারা সর্ব্বদা চালিত হইলেই যে সৎপথে চলিয়া যাইতে পারি, তাহা নহে, বিবেকের সহিত যখন অতীত সময়ের সমস্বরের ঐক্য থাকে না, তখন নিশ্চয় বুঝিতে হইবে, আমরা ভ্রম দ্বারা চালিত হইতেছি।

স্বীয় স্বীয় বিবেককে পবিত্র ও পরিস্কৃত করা যেমন উচিত, সেই প্রকার অতীত সময়ের সমস্বরকে মান্য করা উচিত। কর্ত্তব্য পরায়ন তিনি, যিনি বিবেক ও মানবের সমস্বরের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া পথে,—স্বীয় কর্ত্তব্যের পথে বাহির হন। সঙ্গীত মুগ্ধ হরিণ শিশু যেমন সকল ভুলিয়া কেবল সঙ্গীতের স্বরই শুনিতে পায়; বৎস-হারা গাভী যেমন আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, সকল ভুলিয়া, বৎসের পশ্চাৎবর্ত্তিনী হয়; সেই সকল মহাত্মারা সেই প্রকার সকল

ভুলিয়া, কেবল মাত্র কর্ত্তব্যের অনুরোধের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, অগ্রসর হইতে থাকেন। সংসারের সুখ ও দুঃখ, সংসারের জ্বালা ও যন্ত্রণা কিছুতেই তাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে পারে না। এই জন্যই মহাত্মা ম্যাজিনী জীবনের এক তৃতীয়াংশ কারাবাসে থাকিয়াও সুখে থাকিতেন, এই অনুরোধেই তিনি সহস্র সহস্র অত্যাচারের ভীষণ নির্ঘোষেও আপন পথ পরিত্যাগ করেন নাই। যদি আমরা কর্ত্তব্যের অনুরোধে লেখনী ধরিতে শিখিয়া থাকি—কারবাস আমাদের পক্ষে সুখ; যদি স্বজাতির উন্নতির প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য জ্ঞান ধাবিত হইলা থাকে, সকল সহ্য করিতে পারি অম্লান বদনে। আর যদি সে প্রকার কর্ত্তব্য বোধ আমাদের না হইয়া থাকে, আমারা নিশ্চয় বিভীষিকা দেখিয়া-ভয়ে কাঁপিয়া যাইব, এবং কম্পিত কলেবরে আপন পথ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিব; নচেৎ কে আমাদিগকে বিচলিত করিবে? এই পৃথিবীর মধ্যে কে বিচলিত করিতে সমর্থ? কর্ত্তব্যের অনুরোধের ন্যায় আর আকর্ষণ নাই;—যেদিন এই অনুরোধের আকর্ষণে দেশবাসী সকলে মিলিয়া আপন পথে চলিতে থাকিবে, সে দিন আমরা এক শুভদিন দেখিয়া মোহিত হইব।

জাতীয় সাহিত্য এবং ধর্ম্মনীতি।

এই খলতাময় জগৎ সংসারে যেমন মনুষ্যের মধ্যে ধর্ম্মবল না থাকিলে, তাহার জীবন ফেণায়মান জলবিম্বের ন্যায় কিম্বা ঘূর্ণায়মান বায়ুর ধূলির ন্যায় অবলম্বন শূন্য হইয়া ক্ষণকাল আপনার অস্তিত্ব অন্যের উপর নির্ভর করে, এবং অচিরাৎ সংসারের অন্য পরমাণুতে বিলীন হইয়া যায়, বা অন্য পরমাণুর সংখ্যা বর্দ্ধন করে; সেই প্রকার জাতীয় সাহিত্যে ধর্ম্মনীতির সুমধুর ভাব এবং মনোহারিতার আকর্ষণ না থাকিলে, তাহা দিন কয়েক পাঠকগণের সন্তোষ বা আসক্তি পরিতৃপ্ত করিয়া, অসময়ে সময় গহ্বরে লুক্কায়িত হইতে বাধ্য হয়। যে দেশের জাতীয় সাহিত্য যত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই দেশের জাতীয় সাহিত্য তত সুদৃঢ় এবং মানবের কল্যানকর। আমরা অদ্যকার প্রবন্ধে জাতীয় সাহিত্য এবং ধর্ম্মনীতির মধ্যে যে একটী দুশ্ছেদ্য বন্ধনী আছে, তাহার বিষয় আলোচনা করিতে অধিকতর প্রয়াস পাইব। বঙ্গদেশের সাহিত্য আমাদের

প্রধান লক্ষ্য; সুতরাং আমাদিগের এ চেষ্টা ও উদ্যম পাঠকগণের ভাল লাগিবে, এরূপ আশা করা যায়।

আমরা জাতীয় সাহিত্য ও ধর্ম্মনীতির সহিত যে দুশ্ছেদ্য বন্ধনের কথা বলিতেছিলাম, তাহা এই,—ইহাদিগের একের অভাবে অন্যটী জ্যোতি-বিহীন, অসার এবং ক্ষণস্থায়ী হইয়া পড়ে। জাতীয় সাহিত্যে ধর্ম্মনীতি শোভিত না হইলে, সে সাহিত্য অন্ধ মানবের অপরিপক্ক জ্ঞানের সম্মুখে আদর পাইলেও, চিরকাল উদার এবং জ্ঞানীর চক্ষে তাহা বিষবৎ পরিত্যক্ত হয়। যে সাহিত্য উচ্চ, নীচ, সর্ব্ব সাধারণের সেবার যোগ্য নয়, তাহা কখনও জাতীয় সাহিতা হইতে পারে না; ধর্ম্মনীতির দ্বারা উজ্জ্বল না হইলে সাহিত্য এই প্রকার সঙ্কীর্ণ স্থানে দণ্ডায়মান থাকিতে বাধ্য হয়। বঙ্কিম বাবুর রাশিকৃত প্রণয়ময় গ্রন্থসমুদ্র আজ বঙ্গবাসীদের ঘরে ঘরে পূজা অর্চ্চনা পাইতেছে, তাহা অস্বীকার করিবে? বাঙ্গালার বর্ত্তমান সাহিত্য সমূহের নীতি বিবর্জ্জিত ভাব দেখিয়া আজ আমাদের কথার সারত্ব অনুভব করিতে কে সমর্থ হইবেন? এদেশের সাহিত্য সংসার দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছে বলিয়া সকলেই নৃত্য করিয়া থাকেন, কিন্তু যে সাহিত্য মানবের কল্যাণকর, এবং চিরকালের আদর পাইবার যোগ্য, সে প্রকার গ্রন্থ কোথায়? আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, যে গ্রন্থে কেবল প্রণয়ের ছড়াছড়ি, কিন্তু নীতির সমুজ্জ্বল ভাব নাই, আমরা বলি যে গ্রন্থে কেবল সার বিহীন, উপদেশ শূন্য বাক্যের আড়ম্বর, তাহা আজ সমাজে আদর পাইলেও এমন এক সময় আগমন করিবে, যখন তাহা ঘৃণার্হ বলিয়া বোধ হইবে; ইহা অবশ্যম্ভাবী কথা। চাকচিক্যময় যৌবনে বারাঙ্গনা-গণের মুখের শ্রী ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া জগৎ সংসার মোহিত হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু নিশ্চর যৌবনের শেষে আর সে প্রকার আদর থাকে না, বরং তৎ-পরিবর্ত্তে ঘৃণা উপস্থিত হয়। বঙ্গদেশে যদি প্রকৃত জ্ঞানী থাকেন, তবে তাঁহারা একবাক্যে অবশ্য স্বীকার করিবেন, বঙ্গদেশের সাহিত্যের অধিকাংশই ক্ষণস্থায়ী। আমরা বলি যে সাহিত্য মানবের উপকার সাধন করে না, কেবল আমোদের সহায়, আমরা বলি যে সাহিত্য জীবন গঠনের পথে সহায় না হইয়া কেবল তাহা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিতে যত্নবান, তাহা কখনও স্থায়ী হইতে পারেনা। যে স্থানে এ প্রকার সাহিত্য চির আসন প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয়, সে দেশ চিরকাল অন্ধকারের ভীষণ রাজ্যের দ্বারা আবৃত থাকে। যে দেশে জ্ঞান

আছে, প্রতিভা আছে, সত্য আছে, ন্যায় আছে, প্রীতি আছে, সে দেশের নীতি বর্জ্জিত সাহিত্য কখনও জাতীয় সাহিত্য বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। জাতীয় সাহিত্য তাহাই,—যাহা চিরকাল জাতির শ্রীবৃদ্ধি সাধন এবং উন্নতির মূলে সার সঞ্চয় করিতে থাকে। জাতীয় সাহিত্য তাহাই, যাহার বলে মৃত, নিস্তেজ, নীরব জীবনে বীর্য্য সঞ্চার হয়, হৃদয়ে সাহস উদ্দীপ্ত হয়, এবং মানবকে কর্ত্তব্য পালনের জন্য অস্থির করিয়া তুলে। কে বলে এ সংসারের নীরস কলমের ক্ষমতা মানবের অন্যান্য ক্ষমতা অপেক্ষা হেয়? কে বলে রক্ত সঞ্চলিত হস্তের বল অপেক্ষা জড়পদার্থ লেখনীর ক্ষমতা অল্প? ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লবের পূর্ব্বে বহু ক্ষমতাশালী রাজা যাহা সম্পন্ন করিতে পারেন নাই, ভলটেয়ার প্রভৃতি আপন লেখনী বলে তাহা সাধন করিয়া গিয়াছেন। আবার ইটালীতে যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা দৃষ্টান্তের আদর্শ স্থানীয়। ম্যাজিনীর লেখনীর তেজেই আজ ইটালীর মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে। ম্যাজিনী জাতীয় সাহিত্যে যে বল সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাহার বলেই আজ ইটালী পৃথিবীর নিকট আবার হাস্য মুখে কথা বলিতে সক্ষম হইয়াছে। কিন্তু ম্যাজিনী কি কেবল প্রেমের কথা, প্রণয়ের কাহিনী বলিয়া জাতিকে উন্নত করিয়াছেন? না—কেবল ধর্ম্মনীতির মহোচ্চ চিত্র আঁকিয়া দেখাইয়াছেন,—সেই দৃশ্য দেখিয়া ইটালী মুগ্ধ হইয়াছে, সেই দৃশ্যে ইটালী অলৌকিক বীর্য্য সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছে। আমরা ইতিহাসের পৃষ্ঠা যত উদ্ঘাটন করিব, ততই প্রতীয়মান হইবে, জাতীয় সাহিত্য ভিন্ন কখনও মানবজাতি উন্নত হইতে পারে না, আর সেই জাতীয় সাহিত্যে ধর্ম্মনীতি না থাকিলে তাহা দ্বারা সমাজের উপকার দর্শে না। আবার অন্যদিকে যত দিন জাতীয় সাহিত্যে ধর্ম্ম-নীতি প্রবেশ না করে, ততদিন ধর্ম্মনীতি হীনপ্রভ হইয়া জগতে অনাদরে গৃহীত হয়। জাতীয় সাহিত্য যেমন ধর্ম্মনীতি ভিন্ন অমঙ্গলের সোপান, সেই প্রকার ধর্ম্মনীতি সাহিত্য ভিন্ন সৌন্দর্য্য বিহীন নীরস কাহিনী। যে দেশের লোকেরা বিদ্বান, জ্ঞানী, ন্যায়বান, সেই দেশই উন্নত এবং সেই দেশের জাতীয় সাহিত্যই নীতির দ্বারা সমুজ্জ্বল, এবং সেই দেশের সাহিত্য মানবের মনে অলৌকিক বল সঞ্চারে সমর্থ। আবার অন্যদিকে যে দেশের সাহিত্যে ধর্ম্মনীতি অণুপ্রবিষ্ট, সেই দেশের ধর্ম্মই প্রতিষ্ঠিত, স্থায়ী, অচঞ্চল এবং সুদৃঢ়। পৃথিবীতে খৃষ্ট ধর্ম্মের যে এত উন্নতি পরিলক্ষিত হয়, ইহার কারণ একমাত্র

জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি, সাহিত্যের গুণেই ইহা মানব হৃদয়ে অলৌকিক আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে; ঊনবিংশ শতাব্দির জ্ঞান গরিমাও আর সে সকল খৃষ্টধর্ম্মের কুসংস্কারময় ভাব মানব মন হইতে বিদূরিত করিতে সমর্থ হইতেছে না। কি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ! জাতীয় গ্রন্থ লিখিতে যাইয়া যাঁহারা কেবল অসার ভাব সমুদ্র মন্থন করিয়া অসার ভাব গ্রথিত করেন, তাঁহাদের পুস্তক আজ জনসমাজে আদৃত হইলেও, চিরকাল তাহা অনাদরের থাকিবে, কারণ নিতান্ত হীনাবস্থাপন্ন লোকদিগের মনও উন্নত হইবে। আবার যাঁহারা সাহিত্য পরিত্যাগ করিয়া অন্য উপায়ে ধর্ম্মনীতি প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাদের সত্য সকল আজ যে প্রকার অনাদৃত, চিরকাল সে প্রকার থাকিবে। পথ এক—অবলম্বন এক। এই পথে সম্মিলন। জাতির সাহিত্য লেখক যে দিন নীতিপরায়ণ হইবেন, সেই দিন সাহিত্যে এক অলৌকিক সৌন্দর্য্য শোভা পাইবে, এবং সেই দিন হইতে সাহিত্য মানবের কল্যাণকর হইবে। ধর্ম্মনীতি সে দিন উপেক্ষনীয় থাকিবে না, এবং মানবের মন নিশ্চয় সে দিন অন্ধকারে বিচরণ করিয়া সুখ পাইবে না। অসার গ্রন্থ সে দিন অসার সংসারের জঘন্য পরমাণুতে মিশিয়া যাইবে। সে দিন কি এদেশে আসিবে!!

জাতীয় জীবন এবং ভারতের দুর্ভিক্ষ।

মানবের হৃদয়ের মধ্যে একটী বিন্দু আছে, যে বিন্দুতে আঘাত করিলে মানব অন্যের জন্য অস্থির হয়। এই বিন্দুর চিহ্ন না থাকিলে মানব, মনুষ্যের মুখশ্রীতে এক অলৌকিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইত না; এ সংসারে কেহই সমাজে আবদ্ধ হইয়া বাস করিত না। সমাজ বন্ধনই বল, আর যাহাই বল, সকলের মূল সেই বিন্দুতে নিবদ্ধ। আমরা সময়ে সময়ে দেখিতে পাইয়া থাকি, স্বার্থ এবং অন্য নানা প্রকার অসৎ বৃত্তির পরাক্রমে কখনও কখনও সেই বিন্দুটী আবৃত্ত হইয়া থাকে, সেই সময়ে আর কাহারও মন অন্যের জন্য অস্থির হয় না। কে না স্বীকার করিবেন, যে প্রেম ও ভালবাসা মানবের হৃদয়ে বিশ্ব নিয়ন্তার প্রত্যক্ষ ছবি; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সময়ে সময়ে আমরা এ ছবিকেও সংসারের স্বার্থের কালিমা দ্বারা আবৃত্ত করিয়া রাখিয়া সুখী হই। অস্বাভাবিক ভাব উপার্জ্জন এবং কৃত্রিম শোভা

সৌন্দর্য্য লইয়াই বর্ত্তমান সময়ের মানব জাতি ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, এবং সেই জন্য বহু চেষ্টাতেও সেই সুন্দর ছবি আর মনুষ্যের হৃদয়ে দেখিতে পাওয়া যায় না। বাহিরের আড়ম্বর, সভ্যতার স্রোতের সুফলই বল, কুফলই বল, সে সৌন্দর্য্যের নিকট স্থান পায় না। আমরা ত এই জরাগ্রস্ত সংসারে যখন দেখি, এক জনের কষ্ট যন্ত্রণা অনুভব করিয়া অন্যের নয়নের জল অবিশ্রান্ত পড়িতেছে; এক জনের সম্মুখের অন্ন সন্তোষের সহিত ক্ষুধিত জনের জীবন রক্ষার জন্য বিতরিত হইতেছে; তখন বাস্তবিক হৃদয়ে সুখ অনুভব করি। ঈশ্বরের সৃষ্টির গুপ্ত মন্ত্রই এই, আমরা সমাজ বদ্ধ না হইয়া থাকিতে পারি না। মনুষ্য সমাজ পরিত্যাগ করিলে মানবের মনে কত কষ্ট হয়, তাহা বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই বুঝিতে পারেন। বাস্তবিক আমাদের মধ্যে এমন আকর্ষণ আছে, যাহাতে সংসারের অন্যান্য মানবগণ আমাদের প্রতি অনুরক্ত, এবং অন্যের হৃদয়েও এমন পদার্থ আছে, যাহা দেখিলে আমরা তাহাদের নিকটবর্ত্তী না হইয়া থাকিতে পারি না। এই ভাব কি কেবল মানব প্রকৃতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়? না তাহা নহে, ইতর জন্তুদিগের মধ্যেও এভাব জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। এক জাতীয় জীব সর্ব্বদাই সেই জাতীয় জীবের সহিত মিলিত হইয়া থাকিতে ভালবাসে। একটী প্রাণীকে দূর স্থানে দেখিলে অন্য প্রাণী তাহার নিকটবর্ত্তী না হইয়াই পারে না। আমরা বিশ্বনিয়ন্তার এই ভাবকে অপহরণ করিতে সমর্থ নহি। কিন্তু স্বার্থের চিন্তায় মানবকে অনেক সময়েই অসার করিয়া থাকে, তজ্জন্যই সময়ে সময়ে মানবের মহত্ব নির্জ্জীব ও শুষ্কপ্রায় হইয়া যায়।

এই যে ভাবের কথা আমরা বলিলাম, ইহার আবার অধ্যায় আছে। সত্য বটে এ সংসারে তাঁহারাই মহৎ, যাঁহারা জাতিবর্ণ ভুলিয়া সকল মানবের প্রতি সমান আকৃষ্ট হন। সকল মানবকে যাঁহারা সমান ভাবে ভাল বাসিতে সমর্থ, তাঁহারা এ সংসারে পূজা পাইবার উপযুক্ত। সে প্রকার জীবের অস্তিত্ব অন্য দেশে সম্ভব হইলেও, আমাদের দেশে নাই; কারণ আমাদের দেশে নির্দ্দিষ্ট স্থানেও ভালবাসাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। আমাদের দেশের লোক সকল ভুলিয়া আপনার স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত। আমাদের দেশের লোক স্বার্থের ক্ষতি করিয়া মহত্ব বিস্তার করিতে ইচ্ছা করেন না। আমাদের দেশের লোক কেবল আড়ম্বর ও বাহ্যিক রকমে অন্যের সহিত মিলিত হইতে চাহেন।

মূল কথা যে দেশে জাতীয় জীবন নাই, সে দেশে সে প্রকার বিশ্বজনীন প্রেম অসম্ভব। আমরা স্বীয় দেশের লোক, যাহাদের সহিত সর্ব্বদা একত্র বাস করি, যাহাদের রক্ত আমাদের রক্তের পরমাণুর অংশ গ্রহণে স্থজিত; যাহাদের আকৃতিতে আর বৈষম্য নাই, আচার ব্যবহারে বিভিন্নতা নাই, আমরা তাহাদিগকেও স্বার্থত্যাগ করিয়া ভাল বাসিতে পারি না। ইহা কি কম আক্ষেপের বিষয় যে, যে দেশে আমরা জন্মপরিগ্রহ করিয়াছি, যে দেশের জল বায়ুতে আমাদের শরীর বর্দ্ধিত হইয়াছে, আমরা সকলে মিলিয়া সেই মাতৃ ভূমির দুর্দ্দশা দূর করিতে পারিতেছি না। যে জাতীয় জীবনকে পৃথিবীর উচ্চ ব্যক্তিরা সঙ্কীর্ণ ভাব বলিয়া থাকেন, আমরা সেই ভাবও উপার্জ্জন করিতে অসমর্থ! যখন আমরা এই সকল কথা ভাবি, যখন ভারতের সামাজিক অবস্থা আমাদের জ্ঞানের সম্মুখে পড়ে, তখন আমরা সকল ভুলিয়া যাই,—কেবল গোপনে অশ্রু বর্ষণ করিতে থাকি। তখন আমাদের মনে এই প্রশ্ন উপস্থিত হয়, যে এ দেশের অবস্থা কি আর উন্নত হইবে না; এক হৃদয় কি অন্য হৃদয়ে মিলিবে না; এক জনের স্বর শুনিয়া কি অন্য সকলে একত্রিত হইবে না; এক জনের দুর্দ্দশা দেখিয়া কি অন্যের চক্ষে জল আসিবে না? আবার ভাবি, যদি সে অবস্থা না হয়, তবে কি কখনও আমরা উন্নতি লাভ করিতে পারিব; যদি সে অবস্থা এই হতভাগ্য দেশে শোভা না পায়, তবে কি আমরা মনুষ্য বলিয়া জগতে পরিচিত হইতে পারিব? অসম্ভব তাহা। এ পৃথিবীতে যে দেশের ছিন্ন ভিন্ন অবস্থা, সেই দেশই উচ্ছিন্ন; আর যেখানে একতা সেই স্থানেই স্বাধীনতা বা মানবের মহত্ব বিস্তার। আমরা যতদিন প্রত্যেকে দূরে থাকিব, ততদিনই আমরা জগতে হেয় থাকিব; যতদিন আমরা অন্যের বিন্দুতে আকৃষ্ট না হইব, ততদিন আমরা জাতীয় জীবন কাহাকে বলে বুঝিতে পারিব না; এবং ততদিন নীরবে আমরা পশুর ন্যায় এ সংসারে বিচরণ করিব। মানবের মধ্যে যে মহত্ব দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়া যাই, সে মহত্ব একতা হইতে উৎপন্ন হয়। আমরা মানব জীবনে যে অলৌকিক ভাব দেখিয়া সময়ে সময়ে মোহিত হই, সে ভাব জাতীয় জীবন হইতে উৎপন্ন হয়। বাস্তবিক যে দেশে জাতীয় জীবন নাই, সে দেশে বিশ্বজনীন প্রেম বিস্তার কি, তাহা অনুভব করিতেও অক্ষম এবং সে দেশ চিরকাল জগতে হেয় ও ঘৃণিত। বাস্তবিক ভাবিয়া দেখিলে কি

বোধ হয়। আমরা কি মনুষ্য? যদি তাই হই, তবে সে সুন্দর বিন্দু কোথায়, যাহা থাকিলে মানব অন্যের দুঃখ দূর না করিয়া থাকিতে পারে না। আমরা কি মনুষ্য? যদি তাই হই, তবে অন্যের কষ্ট দেখিলে আমাদের প্রাণ কান্দে না কেন? আমরা কি মনুষ্য? যদি তাই হইব, তবে ভারতের এই দুর্দ্দশার সময়েও শীতল বায়ু গায়ে লাগাইয়া; সৌভাগ্যের সেবা করিতে করিতে নাট্যশালায়, মাদকালয়ে, এবং বারাঙ্গনালয়ে নিমেষ মধ্যে লক্ষ লক্ষ টাকা উড়াইয়া দিব কেন? কি আক্ষেপের বিষয়! ভাবিলে কি শরীর রোমাঞ্চিত হয় না? দেশের দুর্দ্দশার বিষয় চিন্তা করিলে কি হৃদয় ও মন অবসন্ন হয় না? কি আক্ষেপের বিষয়! অন্যকে তিরস্কার করিবার সময় আমরা প্রস্তুত, কিন্তু স্বীয় জাতির অভাব মোচন করিবার চিন্তাও আমাদের মনে স্থান পায় না। বেহার, বম্বে, মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষ, এবং পূর্ব্ববাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ দেখিয়া আমরা নিশ্চয় বুঝিয়াছি, এ ভারতে দুর্ভিক্ষ চির আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। যে দেশে লক্ষ লক্ষ প্রাণী দুর্ভিক্ষের ভীষণ কবলে পতিত, সে দেশের লোকের কি অন্য চিন্তা করিবার সময় আছে? যে দেশের লক্ষ লক্ষ প্রাণীর আর্ত্তনাদে গগন পরিপূর্ণ, সে দেশে যদি মনুষ্য থাকে, তবে তাহারা কি অন্য চিন্তা করিয়া সময় কর্ত্তন করিতে সমর্থ? অনেকে বলিবেন, সমর্থ বই কি! নচেৎ আমাদের দেশে কি দেখিতেছি। আমরা বলি, আমাদের দেশে এইক্ষণ আর প্রকৃতিস্থ মানব নাই। যাহা কিছু দেখা যায়, সকলই রোগগ্রস্ত। আমরা বলি মানবের মধ্যে যে বিন্দুর আকর্ষণে জাতীয় জীবন গঠিত হয়, সেই প্রেমের ছবি স্বার্থের কালিমায় মলিন হইয়া গিয়াছে। আমরা বলি, যাহা কিছু আমরা দেখিতে পাই, এ সকলই শ্মশানের ছবি। আমরা বলি, এদেশে ভবিষ্যতে যাহা হইবে, তাহা কেবল শ্মশান বই আর কিছুই নহে। আমাদের এ কথারও কি আবার প্রতিবাদ হইবে? আমাদের এই জীবিত সত্যের বিরুদ্ধেও কি আবার তর্কের তরঙ্গ উঠিবে; মনুষ্য যদি এ দেশে থাকে, তবে কখনও উঠিবে না। সভ্যতার আন্দোলনই বল, রাজনীতির সুখের কথাই বল, ভাই, এ সকল কাহার জন্য? তুমি একা সভ্য হইবে, একা স্বাধীন হইবে? আপনি স্বাধীনতার আস্বাদন অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইবে বলিয়া কি তোমার এত পরিশ্রম? ভাই,—স্বাধীন দেশে গমন কর। যে দেশের বায়ু পরাধীন, যে দেশের জল পরাধীন, সে দেশে একা

স্বাধীন হইতে পারিবে না। আর যদি বল এ দেশকে স্বাধীন করিবে, তবে অগ্রে দেশের প্রাণ বাঁচাও, অগ্রে সকলের দুঃখ দূর করিতে অগ্রসর হও। মুষ্টি বদ্ধ করিয়া যদি এ দেশের সহস্র যুবক অগ্রসর হয়, তবে কি দুর্ভিক্ষের ভীষণ মূর্ত্তি দূর করিতে পারে না? ভাই, নৈরাশ হও কেন? জাতীয় জীবনে বন্ধনী লাগাও, এক জনের দুঃখ দূর করিতে যাহাতে সহস্র জন অগ্রসর হয়, তাহা করিতে যত্ন কর। যত দিন তাহা না করিবে, সকলই বৃথা; যত দিন দেশের লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মরিয়া যাইবে এবং অন্য লক্ষ লক্ষ লোক হাসিতে থাকিবে, তত দিন এ দেশের কিছু হইবে না। সময় ত উপস্থিত, জাতীয় সহানুভূতি দেখাইবার ইহাপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট সময় কি হইতে পারে? যদি ভারতের প্রত্যেকে ১০ করিয়া প্রদান করে, কত টাকা হইয়া যায়। এমন সুখ আর কিছুতেই নাই, এমন সুন্দর ছবি ত আর কোথাও নাই। ভারতের এক বিভাগের কষ্টের কথা শুনিলে চতুর্দ্দিক হইতে যে দিন একটী একটী পয়সা সংগৃহীত হইয়া কোটী কোটী টাকা হইবে, সে দিন বুঝিব, এদেশে জাতীয় জীবন গঠিত হইয়াছে; এবং সেই দিন আশা করিব, এ দেশের ভবিষ্য ইতিহাসে উন্নতি আছে। যদি তাহা না হয়, কয়েক বৎসর পরে এ ভারতে যাহা দেখিব, তাহা কেবল শ্মশান।

মানব জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য।

"We must convince men that they are all sons of one sole God, and bound to fulfill and execute one sole law here on earth; that each of them is bound to live, not for himself, but for others; that the aim of existence is, not to be more or less happy, but to make themselves and others more virtuous; that to struggle against injustice or error (wherever they exist) in the name and for the benefit of their brothers, is not only a right but a duty; a duty which may not be neglected without sin, the duty of their whole life."

JOSEPH MAZZINI.

সমস্ত ভারতবর্ষের যে প্রকার অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, ইহার মধ্যে মানব জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য নির্দ্ধারণ করিতে প্রয়াস পাওয়া কেবল বিড়ম্বনা মাত্র, তাহা যে আমরা না বুঝিতে পারি, তাহা নহে। আমরা অনেক সময়েই ফলের প্রতি চক্ষুকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারি না, কিম্বা রাখিতে ইচ্ছাও করি না। আমাদিগের প্রতীতি আমরা সাহস সহকারে জনসমাজে প্রচার করিবই করিব, ফল হয় ভালই, না হইলেই কি আমরা আমাদিগের জীবনের কর্ত্তব্য পথ পরিত্যাগ করিতে পারি?

কি সমাজ সংস্কারক, কি ধর্ম্মনীতিজ্ঞ, কি সংশয়বাদী, ইহাঁরা সকলেই এক মুখে বলিবেন, আমার জীবনের কোন না কোন উদ্দেশ্য আছে। সময় ভেদে, রুচি ভেদে, অবস্থাভেদে ও শিক্ষাভেদে যদিও সে উদ্দেশ্য নানা বিভাগে পরিণত হইতে দেখা যায়, কিন্তু তাই বলিয়া কেহই, জীবনের উদ্দেশ্য নাই, এ কথা বলিতে পারেন না। পর্ণকুটীরবাসী দীন দরিদ্র অল্পে অল্পে পদ সঞ্চলন করিয়া ঐ যে ক্ষেত্রাভিমুখে চলিয়া যাইতেছে, উহা কিসের জন্য? আর ঐ যে ধনী দ্বিতল অট্টালিকায় সুখের হিল্লোলে নৃত্য করিতেছেন এবং চতুর্দ্দিকে সেই তালে তালে আর সহস্র অধীনস্থ লোককে নাচাইতেছেন, উহাই বা কিসের জন্য? মাতা সংসারের সকল পরিত্যাগ করিয়াও ঐ যে পুত্রের প্রফুল্ল মুখ-কমল দেখিয়া আশার পর আশার লীলা দেখিতেছেন, উহাই বা কি, আর ঐ যে ধার্ম্মিক সকল বিপদের মধ্যে এক অবলম্বন ধরিয়া অটল ভাবে বসিয়া রহিয়াছে, উহাই বা কি? সকলেই বলিবেন, সকলেরই উদ্দেশ্য এক;—মানবজীবনের কর্ত্তব্য পালন। এই খলতাময় সংসারে যিনিই যাহা বলুন না কেন, সকলেরই জীবনের উদ্দেশ্য আছে, এবং সকলেই সেই উদ্দেশ্য সাধনে রত। বিশ্বনিয়ন্তার এই যে অকাট্য বন্ধন, ইহা কেহই ছিন্ন করিতে সক্ষম নহেন। কিন্তু সকল উদ্দেশ্যের মধ্যে একটী সার উদ্দেশ্য আছে মানবের, যাহার জন্য সমস্ত সংসার ব্যস্ত। অবিশ্বাসী কিম্বা সংশয়বাদী আপন মত বজায় রাখিবার জন্য মুখে যাহাই বলুন না কেন, অন্তরে অন্তরে সেই উদ্দেশ্য অভিমুখে অলক্ষিতভাবে সকলেই অগ্রসর হইতেছেন, এবং সকলকেই অগ্রসর হইতে হইবে। আমরা অনেক সময়েই দেখিতে পাই, সংসারে ক্ষণস্থায়ী সুখের আশায় কিম্বা প্রলোভনের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া অনেকেই সে উদ্দেশ্য ভুলিয়া অগম্য পথে পদশ্চারণ করিয়া কৃতার্থ হন, কিন্তু

ইহা নিশ্চয় যে তাঁহাদিগের জীবন আশু সেই মহৎ উদ্দেশ্য পানে ধাবিত না হইলেও এমন একদিন আসিবে, যেদিন তাঁহারা আপনাদিগের জীবনের অভাব বুঝিয়া আবার গম্য পথে উপস্থিত হইবেন। মানব যিনি যে পথেই বিচরণ করুন না, সকলের জীবনের উদ্দেশ্যই এক, সকলের জীবনের লক্ষ্যই এক। যাঁহারা পূর্ব্বাবধি আপন পথ বাছিয়া লইতে পারেন, তাঁহারাই এ সংসারে ধন্য। যাঁহারা বাল্যকাল হইতেই সেই উদ্দেশ্যের পানে ধাবিত হন, তাঁহারাই এ সংসারে সুখী। অনেকে বলিবেন, তাহাই যে মহৎ উদ্দেশ্য, তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ এই,—মানব অন্য পথে বিচরণ করিয়া কখনও সুখ ও শান্তি পায় না। যদি ইচ্ছা হয়, আমাদিগের কথার প্রমাণ সংগ্রহ কর। পৃথিবীর সকল বিভাগ তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা কর, সকল স্থানেই উত্তর পাইবে, 'এ পথে সুখ ও শান্তি নাই।' আমরা যে পথের কথা বলিতেছি, এই পথে আসিয়া দেখ, কত সুখ ও কত শান্তি। এ সকল কি কল্পনার কথা? না,—ইহার মধ্যে বাস্তবিক সার সত্য আছে।

আমরা মানব জীবনের যে মহৎ উদ্দেশ্যের বিষয় বলিব তাহা এই,—মানবের আপনার স্বার্থ ভুলিয়া পরের জন্য জীবন সমর্পণ করা। আপনার স্বার্থ লইয়া এসংসারে সকলেই ব্যস্ত, সকলেই চিন্তিত, কিন্তু আপনার স্বার্থকে পরের জন্য বিসর্জ্জন দিতে কে সমর্থ? মানব যখন আপনার জীবনের সার সম্বল সেই একমাত্র চিরসুহৃদের পানে তাকাইয়া আপন জীবন বীরের ন্যায় অন্যের অশ্রু মুছাইবার জন্য উৎসর্গ করে, তখন তাহার মুখশ্রী কত সুন্দর হয়! পৃথিবীর একজন বিখ্যাত ধার্ম্মিক বলিয়া গিয়াছেন, আমাদের জীবন আমাদের জন্য নহে, তাহা অন্যের সেবার জন্য। যাঁহারা অন্যের হৃদয় ও মনকে ধর্ম্ম ও নীতির পথে আনয়ন করিতে না চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগের জীবন অসার। বাস্তবিক দেখিতে গেলে এ সংসারে যদি কিছু সুখ থাকে, তাহা অন্যের সেবায়। ভারতবর্ষে কি এ প্রকার জীবন আছে? আমাদের স্মরণ হয় না, সে প্রকার জীবনের অস্তিত্ব এ ভারতে কল্পনাও করিতে পারি না। দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষক এবং নিম্নশ্রেণীর মনুষ্য,—ধর্ম্মহীন, জ্ঞানহীন, মূর্খ, বিদ্যাহীন, এ সংসারের যাহা কিছু আদরের সকল হীন, এই নিম্নশ্রেণীর লোকের জন্য, কই, একজনকেও ত চিন্তা করিতে দেখিতে পাই না। রাজনীতির আন্দোলন, কিম্বা সমাজনীতির আন্দোলন, ইহা যতদিন না প্রত্যেক

ভারতবাসীর অন্তর স্পর্শ করিবে, যতদিন না সকলে সমানভাবে আপন আপন জীবনের অভাব বুঝিতে পারিবে, তত দিন কিছুতেই কিছু হইবে না। যদি সে প্রকার একটী জীবনের অস্তিত্বও আমরা অনুভব করিতে পারিতাম, তাহা হইলেও আমাদের আশা হইত, এক দিন এদেশে সমবেত বল কাহাকে বলে, তাহা সকলের হৃদবোধ হইবে; তাহা হইলে বুঝিতে পারিতাম, এক দিন এদেশে একটী সাহানুভূতির ধ্বনিতে সমস্ত ভারতের হৃদয়ের তন্ত্রী বাজিয়া উঠিবে। সে প্রকার ধর্ম্ম নাই,—সে প্রকার স্বার্থ শূন্য জীবন নাই। তাই দেশের দুরবস্থা অবসান হইয়াও হয় না, এক জনের দুঃখ দূর হইতে না হইতে আর শত জন দুঃখে পতিত হয়। ভারতের কতলোক বিদ্যাহীন, তাহার গণনা কে করিয়াছে? ভারতে কত মনুষ্যের জীবন বর্ত্তমান সময়ে পশুর ন্যায়, তাহা কাহার হৃদয়কে আন্দোলিত করিয়াছে? এদেশের কত লোক অসহায়, তাহা গণনা করিয়া কাহার নয়ন হইতে জল পতিত হইয়াছে? যদি এ দেশের কিছু হয়, তবে সেই প্রকার লোকের দ্বারায় হইবে, যে নিজের স্বার্থ অন্যের জন্য ডুবাইতে পারিয়াছে। এ দেশে যদি কিছু হয়, তবে তাহার দ্বারা হইবে, যাহার জীবনের উদ্দেশ্য কেবল অন্যের উপকার, যাহার ধর্ম্ম কেবল অন্যের পদ সেবা, যাহার চিন্তা কেবল অন্যের অভাব দূর করা। সেই প্রকার জীবন যাহার আছে, তাহার মধ্যে একটী বল দেদীপ্যমান থাকে, সে বল 'ধর্ম্ম বল।' এই ধর্ম্মবল ভিন্ন মানব কখনই অধিককাল কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করিতে পারে না। এই ধর্ম্মবল ভিন্ন মানব যুদ্ধক্ষেত্রের ভীষণ অস্ত্রাঘাত সহ্য করিয়া অটল থাকিতে পারে না। অনেকে বলিয়া থাকেন, ধর্ম্মবল ভিন্নও লোক ভাল থাকিতে পারে। আমরা সে কথা অস্বীকার করি। আমরা ধর্ম্মকে কোন সীমাবদ্ধ স্থানে দেখিয়া পুলকিত হই না। ধর্ম্ম এই পৃথিবীময়; যেখানে সত্য, যেখানে ন্যায়, যেখানে প্রীতি, যেখানে পবিত্রতা, এক দিকে সেখানে যেমন ধর্ম্ম; সেই প্রকার যেখানে পরোপকার, যেখানে দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতি, অন্য দিকে সেখানেও ধর্ম্ম। যাঁহারা ধর্ম্মভিন্ন রাজনীতিকে অন্য স্থানে দেখিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রকৃত রাজনীতির ছবি দেখিতে পান না, তাঁহারা যাহা দেখেন সে রাজনীতির ছায়া মাত্র। এই জন্যই ব্রিটীশরাজনীতি দিন দিন এত দূষিতভাবে আমাদিগকে জ্বালাতন করিতেছে। রাজনীতি যখন ধর্ম্মনীতির দ্বারা উজ্জ্বল হয়, তখন প্রকৃত সাজ ধারণ করে, তখন রাজ-

নীতি পৃথিবীর উপকারের বলিয়া প্রতীয়মান হয়। নচেৎ একাধিপত্য, পাশব-বল প্রয়োগ—দুর্ব্বলকে পীড়ন করিয়া অন্য দেশ লুণ্ঠন ; এ সকল রাজনীতির অত্যন্ত ঘৃণিত অঙ্গ। আমরা এ প্রকার রাজনীতির জ্বালায় অহঃরহ জ্বলিয়া মরিতেছি। যেমন রাজনীতি সম্বন্ধে, সেই প্রকার সমাজনীতি সম্বন্ধে, সেই প্রকার অন্যান্য বিভাগ সম্বন্ধে ;—ধর্ম্মই সকলের সার, এবং ধর্ম্মই মানব জীবনের অবলম্বন এবং ধর্ম্ম হইতে যে স্বার্থ ত্যাগের ভাব মানব মনে উদিত হয়, তাহাই মানব জীবনের প্রকৃত মহৎ উদ্দেশ্য। পরের জন্য জীবন, পরের জন্য সকল ; পরকে আপন জ্ঞান করাই মহত্ত্ব, ইহা যে দিন সকলে বুঝিবেন, সে দিন নিশ্চয় ভারতবর্ষের নিম্ন শ্রেণীর দুর্দ্দশার হ্রাস হইবে ; এবং নিশ্চয় সে দিন এদেশ স্বাধীনতার আস্বাদন বুঝিবে।

সত্য না ভালবাসা ?

পৃথিবীতে নীতি পরায়ণ মনুষ্য মণ্ডলীর মধ্যে নীতিসাধারণের পরস্পরের বিরোধ উপস্থিত না হইলেও, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য, যে ক্ষুদ্রগতি দুর্ব্বল মানব একদিক বজায় রাখিতে যাইয়া অন্য দিক ডুবাইয়া দেয়। বাস্তবিক যাঁহারা এ সংসারের সকল দিক রক্ষা করিয়া চলেন, তাঁহারা কখনও নীতি পরায়ণ হইতে পারেন না। নীতি পরায়ণ ব্যক্তিদিগকে জগতের অধিকাংশ লোকই পূজা করিয়া থাকে, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে ? এক দিকে যেমন তাঁহারা পূজা পাইয়া থাকেন, অন্যদিকে তাঁহাদিগকে অসঙ্খ্য নিন্দাবাদ, তিরস্কার, গঞ্জনা সহ্য করিতে হয় ; এই বিপদ সঙ্কুল সংসারে প্রথমে তাঁহারা নীতির জন্য সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হন না। অদ্যকার প্রস্তাবে আমরা মনুষ্যের ভালবাসার মুখাপেক্ষী হইয়া চলিলে যে সত্য রক্ষা হয় না, তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

প্রেম মানব হৃদয়ের উৎকৃষ্ট ভূষণ ; যে সকল উৎকৃষ্ট গুণের অস্তিত্বে মানব পশু শ্রেণী হইতে উচ্চ আসন লাভে অধিকারী, সে সকল গুণের মধ্যে প্রেম অত্যন্ত সমাদরের। বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বরের এই প্রকার কোমল অথচ মন মুগ্ধকর চিত্র, এই জরাজীর্ণ সংসারে আমরা দেখি বলিয়াই, পৃথিবীকে

সুখের বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি; এই প্রেমের আকর্ষণে জগৎব্যাপী ভ্রাতা ভগ্নির মুখের শ্রীতে এক অলৌকিক সৌন্দর্য্য বিদ্যমান দেখিতে পাই বলিয়া, সংসারকে আবাসের স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করি, নচেৎ ইহা নিরয়-নিবাস হইতেও ভয়ানক হইত;—না হইলে ইহা পিশাচেরও বাসের যোগ্য হইত কি না সন্দেহ।

আমরা যে ভালবাসার কথা বলিতেছি, ইহা প্রেমের রূপান্তর কিন্তু একটু বিভিন্ন প্রকারের। প্রেমের পথে বিচরণ করিতে যাইয়া অনেক সাধক, বা ধার্ম্মিক মধ্যে মধ্যে পবিত্রতা হারাইয়া যেমন ইহাকে অপবিত্র করিয়া তুলে, অর্থাৎ এই পবিত্র প্রেমের চিত্রকে কালিমা দ্বারা মলিন করিয়া ফেলে, সেই প্রকার প্রেমের রূপান্তর যে ভালবাসার কথা আমরা বলিতেছি, ইহা হৃদয়ে উপার্জ্জন এবং বর্দ্ধন করিতে যাইয়াও লোক অনেক সময়েই আপনাকে ভুলিয়া যায়, এবং আপন কর্ত্তব্য জ্ঞানকে বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। এই ভয়সঙ্কুল সংসারে ভাল পদার্থ হইতে সময়ে সময়ে পরম প্রাণ সংহারক পদার্থ উৎপন্ন হয় বলিয়া কি লোক সেই পদার্থ পরিত্যাগ করিতে পারে? ভালবাসা ভিন্ন মানব জীবনের অস্তিত্ব অসম্ভব;—যে মানবের হৃদয় ভালবাসায় অবনত নহে, সে মানব পণ্ডিত বা বিদ্বান হইতে পারেন, কিন্তু এ সংসারে তিনি চিরকাল কঠোর অসুর বলিয়া অভিহিত হইবেন। সে মানব সংসারকে কেবল কষ্টের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। এই ভালবাসা হইতে সময়ে সময়ে মনুষ্যত্ব বিনাশক গরল উৎপন্ন হয় বলিয়া কি ইহা অনবলম্বনীয়?—না তাহা বলিতেছি না। অগ্নি হইতে সময়ে সময়ে সংসারের অনেক অনিষ্ট সাধিত হয় বলিয়া কি অগ্নির উপকার বিস্মৃত হওয়া এবং উহাকে পরিত্যাগ করা উচিত? নদীর গর্ভ কত সময়ে কত অর্ণব আরোহী সমেত আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া কি জলের সহিত মানব সম্বন্ধ ছিন্ন করিবে? না—তাহা বলিতেছি না। আমরা যাহা বলি তাহা এই—সর্ব্বদা সতর্কভাবে থাকা উচিত। ভালবাসি—আমার চতুর্দ্দিকের বন্ধুবান্ধবকে,—ভালবাসি আমার চতুর্দ্দিকস্থ আত্মীয় স্বজন, দূরস্থিত স্বজাতীকে এবং বহুদূরস্থিত সমগ্র মানব সম্প্রদায়কে;—কিসের জন্য? অন্যকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারি না বলিয়া, কেবল ভালবাসার জন্য ভালবাসি। কেবল ভালবাসার জন্য যাঁহারা অন্যকে আপন হৃদয়ে রাজত্ব
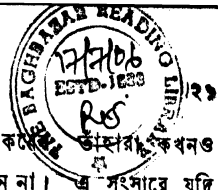
করিতে দেন, কিম্বা আপনি অন্যের হৃদয়ে রাজত্ব করেন, তাঁহারা কখনও ভালবাসায় বিঘ্ন এবং ভালবাসায় বিভীষিকা দেখেন না। এ সংসারে যদি সুখ শান্তি থাকে, তবে তাহা তাঁহারাই ভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করিবার জন্য অল্পে অল্পে অলক্ষিত ভাবে জাল বিস্তার করিয়া অন্যকে তাহাতে বদ্ধ করেন, কিম্বা অন্যের জালে বদ্ধ হন, তাঁহাদিগের নিকট ভালবাসা ঘোরতর নরক ভোগ। যতক্ষণ তাঁহারা স্বার্থ চরিতার্থ করিতে না পারেন, ততক্ষণ এক অভূতপূর্ব্ব, অচিন্ত্য বন্ধনে তাঁহারা আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য হন; এত মুগ্ধ হইয়া যান যে, ইচ্ছা করিয়াও আর আপনি সেই ভালবাসার জালই বল বন্ধনই বল, ছিন্ন করিয়া আসিতে পারেন না। অলীক স্বপ্ন দেখিলে মানব যেমন উঠিতে চাহিলে উঠিতে পারেনা, মুখ খুলিয়া কথা বলিতে চাহিলেও বাক্‌নিষ্ক্রান্ত হয় না, সেই প্রকার তাঁহারাও ইচ্ছা থাকিলেও আর বাহির হইয়া আসিতে পারেন না। সেই ভালবাসার অনুরোধে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের সত্য, ন্যায়, পবিত্রতা সকল বিসর্জ্জিত হয়। বাস্তবিক যাঁহারা কখনও এই প্রকার স্বার্থ চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া এই প্রকার ভালবাসার জালে জড়িত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মনুষ্যত্ব, জ্ঞান, গৌরব, এবং যাহা কিছু উপার্জ্জনের উপযুক্ত, সকলি তাঁহারা অম্লান বদনে বিসর্জ্জন দিয়া বসেন।

ভালবাসার আর এক রাজ্য আছে। এ রাজ্যে মানব স্বার্থের চিন্তায় প্রবেশ না করিয়াও এক মহা মায়ায় জড়িত হইয়া পড়ে। ইহার প্রকৃত কারণ মানব মনের দুর্ব্বলতা। প্রথম যখন এই ভালবাসার রাজ্যে প্রবেশ করে, তখন মনে করে,—বাস্তবিক ইহাতে কৃতার্থ হইব;—যখন চতুর্দ্দিক হইতে সারি সারি লোক এক হাতে স্তুতিবাদ বা তোষামোদের পাত্র, অপর হস্তে ভালবাসার পাত্র লইয়া দিনে দিনে, তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, তখন সাধ্য কি মানবের, যে সেই চিত্রকে প্রলোভনের চিত্র বুঝিয়া দূরে পলায়ন করিবেন? যাঁহারা এ প্রকার সময়েও দূরে যাইতে সক্ষম, এ প্রকার ভালবাসার রাজ্যে প্রবেশ করিলেও তাঁহাদের আত্মরক্ষার ভয় নাই,—তাঁহারাই এ সংসারে মনুষ্য, তাঁহারাই ধার্ম্মিক বা সাধক। কিন্তু সে প্রকার ধার্ম্মিক বা সাধকের অস্তিত্ব সংসারে অতি অল্প। ফাঁদে প্রবেশ করিতে করিতেই মনের সৎ সাহস চলিয়া যায়, উৎসাহ উদ্যম একেবারে বিনষ্ট হয়,

চলিবার শক্তি রহিত হইয়া যায় ;—মুখ থাকিতেও ভাষা বাহির হয় না। এই প্রকারে যাঁহারা ভালবাসার দাসত্বে আপনাদিগের জীবন সমর্পণ করেন, তাঁহারা সত্য বা ন্যায়ের ধার ধারেন না। তাঁহারা ধর্ম্ম বা অধর্ম্মের ধার ধারেন না ; তাঁহারা কেবল জানেন মায়াময় ভালবাসা। ভালবাসার সেবা করিতে যাইয়া যাঁহারা এই প্রকার পৃথিবীস্থ সকল উৎকৃষ্ট ভূষণ হইতে বঞ্চিত হন, তাঁহাদিগকে সংসারের লোকেরা দুর্ব্বল, অকর্ম্মণ্য বলিয়া অভিহিত করিয়া নিবৃত্ত হয় ; আমরা এবম্প্রকার মানবকে জগতের মহা অনিষ্টকারী বলিয়া জানি। সত্য ও ন্যায় তাঁহাদের নিকট অবহেলিত হইয়া হইয়াই আজ পৃথিবীতে আর স্থান পাইতেছে না,—তাহাদের নিকট উপেক্ষিত হইয়াই, সত্য ও ন্যায় আর মানবের মনোরাজ্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে পারিতেছে না।

এক দিকে যেমন আমরা এ প্রকার ভালবাসাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করি, আবার অন্যদিকে কেবল ভালবাসার জন্য যে ভালবাসা তাহাকে হৃদয়ের সহিত আলিঙ্গন করি। ভালবাসা চাই মানবের,—নচেৎ মানব হৃদয় পশুর হৃদয়,—পিশাচের হৃদয়। কিন্তু ভালবাসা চাই বলিয়া সত্যকে ও ন্যায়কে বিসর্জ্জন দিতে পারি না। যে ভালবাসার মধ্যে কোন প্রকার স্বার্থ নাই, তাহা কখনও সত্য ও ন্যায় ছাড়া থাকিতে পারে না ; সে ভালবাসার মধ্যে সকল বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু যে ভালবাসায় সত্যের অবমাননা হয়, যে ভালবাসায় মুগ্ধ হইলে সত্য রক্ষার জন্য মানব আর বল পায় না,—ভাষা পায় না—উৎসাহ পায় না,—আমরা সে ভালবাসা চাই না। সত্য ও ন্যায়কে আমরা সকল অপেক্ষা আদরের মনে করি—এই সত্য পালন করিবার জন্য যাঁহারা অগ্রসর,—তাঁহাদিগের বিপদে ভয় নাই—শত্রুর চিন্তা নাই,—ভালবাসায় স্বার্থ নাই। আমরা যদি এই প্রকার সত্যকে আলিঙ্গন করিতে পারি, সংসারের সকল পরিত্যাগ করিতে পারি অম্লান বদনে। আমরা যদি প্রকৃত প্রস্তাবে এইপ্রকার সত্যের আদর করিতে সমর্থ হইয়া থাকি, আমরা এ সংসারের কাহাকেও ভয় করি না। সত্যের পথে যদি ভালবাসা কণ্টক হয়, আমরা ভালবাসাকে ছিন্ন করিতে কুণ্ঠিত নহি। এই সত্যের জন্য দেশীয় বন্ধু বান্ধব, সহোদর সহোদরার মনে যখন শেল বিদ্ধ করিতে পারিয়াছি, তখন নিশ্চয় আমরা ব্যক্তি বিশেষের মুখের সৌন্দর্য্য দেখিয়া ভুলিব না।

যাঁহারা স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করিবার জন্য ভালবাসার জালে আবদ্ধ হন, আমরা তাঁহাদিগকে কৃপা নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া থাকি। সত্যের জন্য জীবন, সত্যের জন্য সকল; আর যদি মানবের মঙ্গলের পথ থাকে, তাহা এই সত্যের পথ। এই পথে বিচরণ করিবার মানসে যে দিন মানব স্বার্থময় ভালবাসার বন্ধন ছিন্ন করিতে কুণ্ঠিত হইবে না, সেই দিন মানব মনের সরল প্রকৃতির আমরা পরিচয় পাইব, সেই দিন অপ্রাকৃত মানবের দুর্ব্বলতার পরিচয়ে আমরা মলিন হইব না, এবং সেই দিন মানবের মধ্যে এক প্রকার অলৌকিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইব।

জীবনের সহিত মুখ বিনিসৃত বাক্যের সম্বন্ধ।

অন্যান্য দেশের মানব চরিত্র অধ্যয়ন করিলে আমরা মানব জীবনে যে সকল মহত্ব দেখিতে পাই, বহু চেষ্টাতেও স্বদেশীয় বন্ধু বান্ধবদিগের মধ্যে তাহা দেখিতে পাই না। মনুষ্য এসংসারে স্রোতের শৈবালের ন্যায় ভাসিয়া অনন্ত কালসমুদ্রে মিশাইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে কি না, সে সম্বন্ধে আমরা কোন কথা বলিব না। জীবনের লক্ষ্য যাঁহারা সুস্থির না করিয়াই কূল-শূন্য সংসার সমুদ্রে জীবনকে ভাসাইয়াছেন, এবং সাময়িক তরঙ্গাঘাতে একবার ঊর্দ্ধ, একবার নিম্নস্থ হইয়া অপরিমেয় কর্দ্দমময় জল-রাশি উদরস্থ করিয়া লীলা খেলিতেছেন, তাঁহারাই সংসারে ধন্য কি না, তাহার মীমাংসাও আমরা করিব না। আমরা যাহা আজ বলিব, তাহা এই——আমাদিগের দেশের অধিকাংশ লোক মণ্ডলীই এই শ্রেণীভুক্ত। তাঁহারা জানেন না কি করিলে কি হইবে; জীবনের কোন্ পথ অবলম্বন করিলে অভিলষিত বিষয় সিদ্ধ হইবে, কোন্ ব্রত গ্রহণ করিলে স্বীয় জীবনের অভাব, জাতির অভাব দূর হইবে, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখিয়া অগ্রসর হন না। স্রোত চলিতেছে তাই তাঁহারা চলিতেছেন, আমাদের বিশ্বাস, যখন স্রোত স্থগিত হইয়া যাইবে, তখন আর তাঁহারা অগ্রসর হইতে পারিবেন না, কিম্বা দৈবঘটনায় যখন পশ্চিমে বহমান স্রোত উত্তরে চলিবে, তখন তাঁহারা আবার আহ্লাদ সহকারে উত্তরে ভাসিয়া যাইবেন। এই যে বর্ত্তমান সময়ে কত শত যুবক

দেশের বিচার লইয়া আন্দোলন করিতেছেন, ঈশ্বর না করুন, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহাদিগের জীবনের লক্ষ্য সুস্থির না হইলে, তাঁহাদিগের উৎসাহ অধিক কাল স্থায়ী হইবে না। মুখের কথা এক বস্তু, জীবনে পরিণতি অন্য বস্তু; মুখের কথা যে স্থানে ফেণায়মান জলবিম্বের ন্যায় বায়ুতে বিলীন হইয়া যায়, সে স্থানের কথার উপকারিতা কিছুই নাই। কথার সহিত যখন জীবনের প্রত্যেক কার্য্য ঐক্য হয়, যখন মুখের কথায় আর জীবনের কার্য্যে বৈষম্য থাকে না, তখনই মানব বাঞ্ছিত স্থানের অধিকারী হয়। আমরা জানি মানচিত্রের অন্যান্যদৃশ্যে এমন সকল মহাত্মা আছেন, যাঁহারা দিবসে অতি অল্প কথা উচ্চারণ করেন, তাহার কারণ এই, কথার সহিত জীবনের সম্বন্ধ থাকিবে কি না, এই বিষয়ে তাহারা অহঃরহ চিন্তা করেন। তাঁহারা জানেন,—এক জনের কথা, যাহা এক সময়ে বায়ুতে বিলীন হইয়া যাইতে দেখা গেল, তাহাই পরমাণুতে পরমাণুতে প্রতিঘাত হইয়া বৎসরান্তে কি শতাব্দী অন্তে কত সুফল সাধন করিতে পারে। তোমার আমার জীবনে দেশের কি উপকার করিতে পারি, যদি আমারা কথার এই প্রকার উপকারিতা বিস্মৃত হই। আজ আমরা ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় সে সকল বাক্য মুহূর্ত্ত মধ্যে বায়ুতে মিশাইয়া যাইতেছি, কে বলিতে পারে, ইহা হইতে আর ফল উৎপন্ন হইবে না? ফল উৎপন্ন হয় কথায়—যাহা লোকে জানে বায়ুতে মিশায়। তুমি গ্রন্থকার, তুমি বক্তা —আর তুমি হিতৈষী, তোমার কোন্ কথায় কি প্রকার ফল প্রসব করিতেছে, তাহা যদি তুমি বুঝিতে পারিয়া না থাক, তবে সতর্ক হও; যদি দেশের উপাকারের ব্রত গ্রহণ করিয়া থাক, তবে জীবনের সহিত যে সকল কথার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পার নাই, তাহা পরিহার কর; মনে রাখিও, তোমার একটী কথায় তোমার দশ বৎসরের পরিশ্রম নিমেষ মধ্যে ভস্ম হইয়া উড়িয়া যাইতে পারে। এসকল ত প্রত্যক্ষ ঘটনা, আমরা প্রত্যহ ইহার পরিচয় পাইয়া থাকি। লক্ষ্য বিহীন, উদ্দেশ্য বিহীন হিতৈষী সহস্র সহস্র কথায় তাহার জীবনকে অসার করিয়া ফেলিতেছে, তাহার জীবনের কর্ত্তব্য আর পূর্ণ হইতেছে না। বাক্যের এমনি শক্তি যে জীবনের কার্য্যের সহিত ঐক্য হইলে একটী বাক্যে সহস্র সুফল উৎপাদন করিতে পারে; আর জীবনের কার্য্যের সহিত ঐক্য না হইলে সকল বিনাশ করিয়া ফেলিতে পারে। সুনীল আকাশে সুখ তারা নিরীক্ষণ করিয়া যেমন পথিক পথে বাহির

হয়; অকূল সাগরে নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যেমন কাণ্ডারী পোত চালাইয়া যায়,—তাহার আর কোন পদার্থে মন থাকে না, যাই চক্ষু ফিরিবে, অমনিই পোত অগম্য পথে যাইবে, এই আশঙ্কা করিতে করিতে যেমন অবিচলিত ভাবে পোত চালাইয়া যায়; সেই প্রকার লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া যে দিন আমাদের দেশের লোক অবিচলিত ভাবে উন্নতির দিকে চলিতে থাকিবেন,—যখন তাঁহাদের বাক্যের সহিত জীবনের কার্য্যে বৈষম্য দৃষ্ট হইবে না,—যখন তাঁহারা একবার ঊর্দ্ধে, একবার নিম্নে, একবার উত্তরে ও একবার দক্ষিণে নীয়মান হইবেন না; সেই দিন বুঝিব, এ দেশে জীবন গঠন হইয়াছে। একটী বাক্য, একটী মহা ঔষধ—একটী বাক্য, একটী বিষপোকা—একটী বাক্য সহস্র জীবন পরিবর্ত্তিত করিতে পারে, একটী বাক্য সহস্র জীবনকে কলুষিত করিতে পারে; এই মহাবাক্যের মর্ম্ম যে দিন আমাদের দেশের প্রত্যেকের হৃদ্বোধ হইবে, সেই দিন দেশের প্রতি আমাদের আশা শত গুণে বর্দ্ধিত হইবে।

দুইটী অসমঞ্জস চিত্র।

বহু দিবস পূর্ব্বে বান্ধবে হরগৌরীর অসমঞ্জস প্রকৃতির তত্ত্বভেদী মনোহর একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা আজ সে প্রবন্ধের সমালোচনা করিবার জন্য চেষ্টা করিব না। আমরাও যখন, কি মানব প্রকৃতি, কি ভৌতিক জগতের ছবি, ইহার কোনটীর তত্ত্ব নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হই, তখনও এই প্রকার মিলন দেখিলে বড়ই সুখী হইয়া যাই। এই শোকদগ্ধ সংসারে স্নেহমাখা জননীর এক নয়নে হাসি, অন্য নয়নে ক্রন্দনের জল; প্রেমের পুত্তলি স্ত্রীর ভালবাসার একদিকে স্বার্থত্যাগের মনোহর চিত্র, অপরদিকে স্বার্থ সিদ্ধির জন্য প্রাণত্যাগ; পুরুষের হৃদয়ের কোমল ভাব, এবং কর্ত্তব্য জ্ঞানের কাঠিন্যতা; অল্প মেঘ মালায় আচ্ছাদিত জগৎ স্নিগ্ধকারী চন্দ্রমার ক্ষীণ অথচ উজ্জল জ্যোতিঃ; একটী কুসুমের অর্দ্ধভাগে কণ্টক, অপর ভাগে কোমলতাময় কুসুমদল; কিম্বা একই পুষ্পে দুই বর্ণ বিস্ফারিত;—প্রকৃতির মনোহর ছবির মধ্যে যখন একদিকে সৌন্দর্য্যের মনোহারিত্ব গুণ দেখিয়া মোহিত, এবং অপরদিকে ভীষণ বিভীষিকা

দেখিয়া কম্পিত কলেবর হই, তখন বাস্তবিক আমাদিগের হৃদয় আনন্দে পরিপ্লুত হয়। এই প্রকার চিত্রে আমরা সুখ বোধ না করিলে, এই দুঃখ পরিপূর্ণ সংসারে ক্ষণিক সুখের লালসায় আমরা কখন ও বাস করিতে পারিতাম না, বিশেষতঃ ইংরাজ প্রকৃতি এবং বাঙ্গালী প্রকৃতির অসমঞ্জস ভাব দেখিয়া, আমরা এতদিন পৃথিবী পরিত্যাগ করিতে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও, বাধ্য হইতাম।

আমরা জানি না, এবং আশাও করি না, আমাদের প্রতীতিতে বঙ্গদেশ এক-স্বরে সম্মতি প্রদান করিবে। আমরা আমাদের মনের কথাই আজ বলিব, এবং অনেক সময়েই বলিয়া থাকি। পৌষ মাসের দেব গর্জ্জন যে কারণে আমাদের হৃদয়ে অমৃত ঢালিয়া দেয়; গ্রীষ্মকালের দিবসের পর রজনীর স্নিগ্ধতাতে আমরা যে কারণে অত্যন্ত সুখ বোধ করি; পরিপাটি নদীর ভীষণ তরঙ্গ দেখিলে যে কারণে আমাদের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়, এবং একদিকে বৃষ্টি ও রৌদ্র দেখিলে যে কারণে আমরা উল্লাসে হাসিতে থাকি; সেই কারণেই বর্ত্তমান শতাব্দীতে একদিকে নিষ্ঠুর, নির্দ্দয় অত্যাচারীর ভীষণ ও কঠোর অনুজ্ঞা, এবং অপর দিকে কোমলমতি দুর্ব্বল নিপীড়িত ও পদ-লুণ্ঠিত ব্যক্তির আর্ত্তনাদ ও সঙ্কু-চিত মূর্ত্তি দেখিয়া সুখ বোধ করিয়া থাকি। কারণ সুখ বোধ না করিলে কি আমা-দের শরীর বর্দ্ধিত এবং মন উন্নত হইত? এ সংসারে যদি কিছু অসম্ভব থাকে, তাহা এই,—মনের সুখ ও শান্তি ভিন্ন মানব কখনও উন্নতি লাভ করিতে পারে না। হয় আমরা অসমঞ্জস চিত্র দেখিয়া সুখ পাইয়া থাকি, না হয় আমরা অনুন্নত। পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা যে শ্রেণী ভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, হইবেন; কিন্তু আমরা দ্বিতীয় শ্রেণী অপেক্ষা প্রথম শ্রেণীতেই অধিক অনুরক্ত। কণ্টকের পাশে পদ্মকে দেখিলে আমাদের আশা হয়, ভরসা হয় যে এক সময়ে এই পদ্ম কণ্টকের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়াই মানব জগতের মনকে আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইবে। বাঙ্গালীর অধীনতার কষ্ট এবং ইংরাজের স্বাধীনতার সুখ যদি আমা-দিগের অসহনীয় হইত, আমরা নিশ্চয় এদেশ পরিত্যাগ করিতাম। আমাদের আশা হয়, ঐ কণ্টকাবৃত ইংরাজ দ্বারা সুরক্ষিত হইয়াই কোমল বাঙ্গালী পদ্মের সৌন্দর্য্য এক দিন জগতের চক্ষুকে আকৃষ্ট করিবে।

আর একটী চিত্র;—আমরা বর্ত্তমান সময়ে এক প্রকার দুর্ভিক্ষের সহিত চির সহবাস করিতে বসিয়াছি। গত কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষের সহিত ভারতের এমনি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, এমনি ভালবাসা জন্মিয়াছে যে

কখনও এই দুর্ভিক্ষ একেবারে পরিত্যাগ করিবে কি না সন্দেহ। দুর্ভিক্ষ পীড়নে ভারতবাসীদিগের উৎসাহ, উদ্যম, বল, ভরসা, আশা একেবারে ডুবিয়া যাইতেছে,—সোণার প্রতিমা অন্ধকারে আবৃত হইতেছে। দিনের পর দিন যাইতেছে, আর ভারতের নিম্নশ্রেণী মলিন হইতেছে। কি দুঃখ জনক চিত্র! যখন ক্ষুধায় অস্থির হইয়া আপন জীবন রক্ষা করিবার জন্য নৃশংস পিতা মাতা সন্তানের ভালবাসা ছিন্ন করে, তখন সে চিত্র দেখিলে কাহার মন না বিস্ময়ে ডুবিয়া যায়! আবার অন্যদিকে পিতা মাতা যখন সন্তানের কষ্ট নিরীক্ষণ করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়া ভালবাসার বন্ধন হইতে বিদায় গ্রহণ করে, তখন সে চিত্র দেখিলেই বা কাহার হৃদয় না গলিয়া যায়! এ সকল কি অস্বাভাবিক ঘটনা? দুর্ভিক্ষ পীড়িত দেশে বাস করিয়াও কি আমরা এ সকল চিত্রকে অস্বাভাবিক বলিতে পারি? আজ আমরা এখানে বসিয়া যতক্ষণ কল্পনা করিতেছি, এই সময়েই কত লোক অনাহারে মরিয়া যাইতেছে,—এই সময়েই কত লোকের ক্ষীণস্বর গগন ভেদ করিয়া উপরে উঠিতেছে। ঐ যে আহারের সময় আসিল, ঐ যে আহারের সময় আসিল, এই চিন্তা করিয়া কত লোক দিন রাত্রি অশ্রু ফেলিতেছে! কি দুঃখ-উদ্দীপক দৃশ্য! পূর্ব্ববঙ্গে হাহাকার উঠিয়াছে! মান্দ্রাজ বম্বে একটু সুস্থ হইতে না হইতেই পূর্ব্ব বাঙ্গলা ক্রন্দন ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইতেছে। যাঁহাদের হৃদয় পর দুঃখে কাতর, যাঁহারা অন্যের অশ্রু দেখিলে আপন অশ্রু সম্বরণ করিতে অক্ষম, তাঁহারা পূর্ব্ব বঙ্গের কষ্টের কথা শুনিয়া নিশ্চয় দুঃখিত হইবেন। এই যে ভয়ানক সময়, এ সময়েও আমরা সুখের সংবাদ প্রাপ্ত হইতেছি। একদিকে যেমন পূর্ব্ব বঙ্গের দুর্ভিক্ষের হাহাকার ধ্বনি আসিয়া আমাদিগের হৃদয়কে অবসন্ন করিতেছে, অপরদিকে ভারতসভার গুণে সাগরের পার হইতে কত শুভ সংবাদ আসিতেছে। ভারতসভা বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে একটী অসমঞ্জস চিত্র আমাদিগকে দেখাইয়া যে কত কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, তাহা ভাষা দ্বারা ব্যক্ত করিতে পারি না। মহামতি গ্লাডোষ্টোন, সুপ্রসিদ্ধ ব্রাইট, ভারতবন্ধু ফসেট প্রভৃতির ভালবাসা ভারতের প্রতি শত গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে; তাঁহাদিগের চেষ্টা, উদ্যম ও ভারতের জন্য স্বার্থ ত্যাগের কথা স্মরণ করিলে কত সুখ হয়! গ্লাডোষ্টোন কমন্স সভাতে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার সারাংশ শুনিয়া কত আশা যুক্ত হইতেছি। ব্রাইট সাহেব জাতি বর্ণ ভুলিয়া উইলিস্ গৃহে ভারতের জন্য যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা পাঠ

করিয়া কত কল্পনার স্বপ্ন দেখিতেছি! ভারতসভার নাম ভারতের অণু-পরমাণুতে গ্রন্থিত থাকুক, আমরা জরাগ্রস্ত ভারতে অসমঞ্জস চিত্র দেখিয়া মোহিত হইয়া যাই।

ভারতসভাকে আমাদিগের একটী অনুরোধ,—প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে ভারতসভা যে উপায় অবলম্বন করিতেছেন, তাহা অসার। সত্য বটে রোগের জ্বালা এত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে যে, ইহাতে প্রলেপ দেওয়া আশু প্রয়োজন; বিলাতে আবেদন প্রভৃতিকে আমরা প্রলেপবৎ মনে করি। প্রলেপে হয়ত এক স্থানের ক্ষত আরোগ্য হইতে পারে; কিন্তু অন্য স্থান যে আবার ক্ষত হইতে পারে, সে আশঙ্কা দূর হয় না। বাস্তবিক শরীরের রক্ত পরিষ্কৃত না হইলে কোন আশা নাই। যাহাতে ভারতবাসীদিগের অন্তর পরিশুদ্ধ হয়, এবং যাহাতে সকলের সত্ব,—সকলের রোগ সকলে বুঝিয়া তাহা দূর করিবার জন্য ঔষধ সেবন করিতে পারে, এবং যাহাতে আর প্রলেপের প্রয়োজন থাকে না, তাহার জন্য সভা চেষ্টিত হউন। দুর্ভিক্ষের মধ্যে ভারতের জীবন রহিয়াছে, দুর্ভিক্ষের মধ্যে ভারতবাসীর উন্নতির মূল নিহিত আছে, তাহা সকলেই বুঝিতে-ছেন; যাহাতে দুর্ভিক্ষের মধ্যস্থিত জীবন ভারতের সকলে লাভ করিতে পারে, তাহার চেষ্টা করুন। অভাব না বুঝিলে কোন দিন, কোন জাতি সেই অভাব দূর করিতে চেষ্টা করে না। দুর্ভিক্ষের মধ্যে যে অভাব এবং তাহা দূর করিবার যে প্রকৃত ঔষধ মানব ইতিহাসে অঙ্কিত আছে, তাহা সকলকে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করুন; তাহা হইলে বিলাতেও লোক পাঠাইতে হইবে না, এবং সাহায্যের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিতে হইবে না, যাহাদের রোগ তাহারাই তাহা দূর করিয়া জীবন রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে। ভারত সভা যদি ভার-তের সকল রোগের ঔষধ যোগাইতে পারেন, তবে ইহার ভবিষ্য অস্তিত্বে কেবল মঙ্গলময় চিত্র দেখিতে পাইবেন।

মানবের উৎকৃষ্ট ভূষণ এবং অপকৃষ্ট আভরণ।

মানবের মধ্যে কতকগুলি ভাব কমনীয়, যাহার পরিচয়ে জনসমাজ মুগ্ধ, স্তম্ভিত এবং বিস্মিত। মানবের অন্তর নিহিত কতকগুলি ভাব বিকশিত হইলে, জনসমাজ শ্রদ্ধা, ভক্তি, এবং ভালবাসা লইয়া সেই ভাবগুলিকে পূজা

করিয়া কৃতার্থ হয়। আবার কতকগুলি ভাব এমনি কঠোর, যে তাহার পরিচয় পাইলে লোকসমাজ বিশ্বপ্রেমের আকর্ষণ ভুলিয়া, ভয়ে সশঙ্কিত হইয়া দূরে গমন করে, এবং অবসর পাইলেও আর সে মানবের সন্নিকটস্থ হয় না;—কতকগুলি ভাব এত ভীষণতর যে তাহার পরাক্রমে লোকসমাজ দগ্ধ, প্রপীড়িত, উৎসন্ন এবং অবসন্ন। পৃথিবীর পণ্ডিতেরা প্রথম শ্রেণীর লোকদিগের ভাবগুলিকে দেবভাব বলিয়া থাকেন এবং শেষোক্ত শ্রেণীর লোকদিগের ভাবগুলিকে পশুভাব বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। আমরা প্রথম শ্রেণীর লোকদিগের বিকশিত ভাবগুলিকে প্রকৃত মনুষ্যত্বের লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করি।

এই বিশ্ববিস্তৃত স্বার্থ এবং চির বৈষম্যময় জগৎ সংসারে যখন দেখিতে পাই,—লোক অত্যাচারের উপর অত্যাচার অক্লান্ত অন্তরে বহন করিতেছে,—কাহারও চক্ষু উৎপাটিত হইতেছে, কাহারও বা মস্তক বিলুণ্ঠিত, কেহ জরাজীর্ণ হইয়া জীবনকে শত্রুর হস্তে ন্যস্ত করিতে বাধ্য হইতেছে,—আবার কাহারও সম্মুখে ইচ্ছা এবং আসক্তির বিরুদ্ধ ঘটনা ঘটাইয়া মনকে তুষের আগুনের ন্যায় দগ্ধ করিতেছে;—কিন্তু তবুও তাঁহারা আপন আপন পথ পরিত্যাগ করিতেছেন না, তখনও স্বজাতির কথা, মানবসমাজের উন্নতির কথা ভুলিয়া যাইতে পারিতেছেন না; তখন বাস্তবিকই আমাদের ইচ্ছা হয় সেই লোকদিগের পদতলে পড়িয়া চিরকাল তাঁহাদিগের কার্য্য সমূহের পূজা করিয়া কৃতার্থ হই।

আবার আমরা যখন এই ঐন্দ্রজালিকভাবে মুগ্ধ সংসারে দেখি, কত মানবজীবন কেবল পরের ভাবনা ভাবিয়াই শেষ হইয়া যাইতেছে,—কত জীবন পরের অশ্রু মুছাইতে, পরদুঃখ অপসরণে, পর উন্নতির চেষ্টাতেই ব্যয়িত হইয়া যাইতেছে, তখন আমরা মানবের অলৌকিক ভাব দেখিয়া মুগ্ধ, স্তম্ভিত এবং বিস্মিত হই। এসংসারে সকল শিক্ষার মূল শিক্ষা—পরের ভাবনা, এসংসারে সকল বিদ্যার উচ্চ বিদ্যা—পরের হৃদয় অধ্যয়ন—এসংসারে সকল ধর্ম্মের মূল পরের জন্য জীবন উৎসর্গ। আমরা যখন এই অহঙ্কারময় সংসারে আন্দোলন শূন্য নীরব জীবন কাহিনী শুনিতে যাইয়া এই প্রকার শিক্ষিত, এই প্রকার বিদ্বান এবং এই প্রকার ধার্ম্মিকের কথা শুনিতে পাই, তখন আমাদের নয়ন হইতে শতধারে আনন্দাশ্রু নিপতিত হয়, ইচ্ছা হয় সেই প্রকার জীবনকে

আলিঙ্গন করিয়া কৃতার্থ হই। এই প্রকার (সাধকই বল যাহাই বল) উন্নত জীবনের অস্তিত্ব কি অস্বাভাবিক? যাঁহারা আজীবন অন্ধ, তাঁহারা চক্ষু থাকিতেও দৃষ্টিহীন; (এ প্রকার অন্ধতা, অহঙ্কার এবং আত্মাভিমান হইতে উৎপন্ন হয়) তাঁহাদের নিকট নিশ্চয় এপ্রকার জীবনের কথা আশ্চর্য্যের বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। যাহারা এসংসারে আপনার মহত্ত্ব কিম্বা সৌন্দর্য্য লইয়াই ব্যস্ত, যাহারা দিবসের মধ্যে দশবার আপনার মুখশ্রী দেখিয়া মোহিত হয়, এবং আর দশবার আপন প্রশংসা অন্য মুখে শুনিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে, নিশ্চয় তাহাদের নিকট এপ্রকার জীবন অস্বাভাবিক বোধ হইবে। আপনার ভাবনা ভাবিতেই তাহাদিগের জীবনের সকল সময় কর্ত্তন হইয়া যায়, কখন আর তাহারা মানবের মধ্যস্থিত ভাবরাশি পরীক্ষা করিয়া আপন জীবনকে সেই ভাবরাশি দ্বারা পরিশোভিত করিতে ইচ্ছান্বিত হইবে? তাহাদের নিকট সমস্ত সংসার থাকিয়াও যেন নাই,—উজ্জ্বল প্রভা দেখিয়াও যেন তাঁহারা অন্ধকারে বিচরণ করেন। কিন্তু যাঁহারা ভাবুক, যাঁহারা চিন্তাশীল, যাঁহারা আসক্তি শূন্য, এবং যাঁহারা এসংসারের সরল শিক্ষার্থী, তাঁহারা একদিকে যেমন জড় জগতের মনোহারিণী সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া অলৌকিক আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন, সেই প্রকার মানব হৃদয়ের স্তর হইতে স্তরান্তরে, অলক্ষিতভাবে প্রবেশ করিয়া এক আশ্চর্য্য সুন্দর রাজ্য নিরীক্ষণ করিয়া এসংসারের সকল ভুলিয়াও সুখ অনুভব করেন। বাস্তবিক মনোরাজ্যের শোভা সৌন্দর্য্যে কেবল তাঁহারাই মুগ্ধ এবং স্তম্ভিত। তাঁহাদের নিকট আমাদিগের কথা সকল কখনও অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইতে পারে না; বরং তাঁহারা যদি নির্ব্বাক না হইয়া ভাষায় মানবের মনোরাজ্যের সৌন্দর্য্য বর্ণন করিতেন, তবে আমরাই তাঁহাদিগের বর্ণিত ভাবকে অস্বাভাবিক বলিতে পারিতাম; কারণ এসংসারের ভাবুক শ্রেণী নীরব, তাঁহারা আপনারাই আপনাদের সুখে নিমজ্জিত থাকেন, ভাষা তাঁহাদিগের মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারে না বলিয়াই তাঁহারা সে চেষ্টায় কৃতকার্য্য হন না। তবুও সময়ে সময়ে অপরিস্ফুট ভাষায় তাঁহাদের যে ব্যাখ্যা শ্রবণ করি, তাহাতেই আমারা বিস্মিত হই, এবং কত অস্বাভাবিক শব্দে মনোভাব ব্যক্ত করি। বাস্তবিক মানবের মধ্যে যে সকল ভাব সাধন সাপেক্ষ, তাহাই মনুষ্যত্ব এবং সেই সকল ভাব বিকশিত হইলেই অন্যের পূজা পাইবার উপযোগী হয়।

আবার অন্যদিকে মানবের মধ্যে কতকগুলি কঠোর ভাব আছে,—যাহার পরিচয়ে জগৎ সংসার কম্পিত এবং বিলোড়িত। কপটতা আচ্ছাদিত মানবের মধ্যে কত প্রকার অসহনীয় ভাব নিমিষে নিমিষে উদিত হইয়া তাহাকে এবং তাহার চতুর্দ্দিকস্থ আত্মীয় স্বজনকে অস্থির করিয়া থাকে, তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এই জগৎ একটী আশ্চর্য্য ক্রীড়া ভূমি,—এই রঙ্গভূমিতে যাঁহারা কপটতার আচ্ছাদন খুলিয়া অন্যের হৃদয়ের ভাব ভঙ্গি দেখিতে সক্ষম, তাঁহারাই মানবের নানা প্রকার কদর্য্য ভাব দেখিয়া ভয়ে কম্পিত হন, এবং কি দেখিলাম,—কি দেখিলাম এই প্রকার ধ্বনিতে সংসারকে সেই সঙ্গে সঙ্গে কম্পিত করেন। মানবের মত যাদুকর এই ভূমণ্ডলে আর দ্বিতীয় জীব পরিদৃষ্ট হয় না। মানব সমাজে আবদ্ধ হইয়া থাকে বলিয়া শরীরের ন্যায় মনের চতুর্দ্দিকেও যে স্তরে স্তরে কত আভরণ দ্বারা আপনাকে ঢাকিয়া রাখে, তাহা বুঝিতে পারিলে এবং প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে সকলকেই বিস্মিত এবং চমকিত হইতে হয়। মনুষ্য আবার মনুষ্যকে উন্মত্ত বলিয়া সম্বোধন করে; মনুষ্য আবার মনুষ্যকে পাগল বলিয়া অভিহিত করে! পাগলের দোষ এই যে, তাহারা সরল,—যাহা মুখে আসে তাহাই বলিয়া ফেলে, মনের ভাব গোপনে রাখিতে পারে না। মনুষ্যও যদি কপটতার আভরণ ছিন্ন করিয়া মনের সকল ভাব ব্যক্ত করিতে যাইত, তবে নিশ্চয় সকল মনুষ্যকেই উন্মত্ত বলিয়া বোধ হইত; এই পৃথিবীময় পাগলের বাস, এ কথা কেহই অস্বীকার করিত না। পাগলের সরলতাকে প্রশংসা কর বা না কর সে এক কথা; কিন্তু যাহাকে পাগল বলিয়া স্বীকার কর না, তাহার কপটতাকে কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া প্রশংসা করিতে করিতে অস্থির হইয়া পড়? মনুষ্যের মধ্যে যদি কোন দোষ থাকে, যাহাতে তাহাকে অন্য প্রকার জীব বলিয়া পরিচয় দেয়, তবে তাহা কপটতা;—এই কপটতা না থাকিলে তুমি, আমি, জগৎ সংসারের সকলেই পাগল। প্রত্যেকের মনের মধ্যে, হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখত, কোন্ মানবের মন কত জঘন্য! হায়, সময়ে এই পৃথিবীতে কপটতাও উৎকৃষ্ট ভূষণের মধ্যে পরিগণিত হইল!!

এই শক্তিময় জগৎসংসারে ইহা আশা করা যায় না যে, সকল মানব আপন আপন বৃত্তি এবং রিপুকে আবশ্যক মত পরিচালিত করিয়া কেবল

উপকার গ্রহণ করিবে। কি নিয়মে সংঘটিত হয়, তাহা বলিতে পারি না—কিন্তু ইহা ঠিক যে মানবের পরমবন্ধু রিপুগণ, এবং মনুষ্যত্বের প্রকৃত লক্ষণ বৃত্তিগণের নানাপ্রকার ভীষণ ভাবে সময়ে সময়ে মানবকে অস্থির করিয়া থাকে। হিংসা, দ্বেষ, পরনিন্দা, পরশ্রীতে কাতরতা প্রভৃতি বৃত্তির অপকৃষ্ট ফল সকল যদি মানবের আত্মাকে মলিন না করিত, তাহা হইলে কেনা স্বীকার করিবেন, যে মানব পৃথিবীতে নিখাত সুখের অধিকারী হইত? আবার অন্য দিকে কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতির উত্তেজিত শক্তি যদি মানবকে অস্থির না করিত, তবে কে অস্বীকার করিবেন, যে মানবই এ সংসারে দেবতা বলিয়া অভিহিত হইত? কিন্তু ইচ্ছা কি প্রবৃত্তির অধীন? কিন্তু মানবের শক্তি কি সকলের জ্ঞানাধীন? যদি তাহা হইত, তবে আর আমাদিগের অদ্যকার প্রস্তাবের অবতারণার আবশ্যকতা থাকিত না। যাঁহারা প্রকৃতির উপাসক, যাঁহারা পৃথিবীর সকল পরিত্যাগ করিয়া দিবা-রাত্রি প্রকৃতির সৌন্দর্য্য এবং তত্ত্ব লইয়াই পড়িয়া রহিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, সময়ে সময়ে তাঁহারাও শক্তির অপব্যবহারে এত ভীত বা বিরক্ত হইয়া পড়েন যে, আর অটলভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় না। প্রকৃতির শক্তির মধ্যেও নানাপ্রকার ভীষণ ভাব রহিয়াছে। জানি না সেই সকল বিশ্বনিয়ন্তার আপন মহত্ব বিস্তারের চিত্র কি না, কিন্তু সেই প্রকার চিত্র দেখিলে ক্ষুদ্রমনা মানব স্তম্ভিত, ভীত এবং বিলোড়িত হইয়া যায়। যখন পৃথিবী-বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া ভীষণতর প্রবলবেগে অগ্নি-শিখা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতে থাকে,—লক্ লক্ ধক্ ধকে যখন সংসারকে ভস্মীভূত করিয়া আকাশকে স্পর্শ করিবার জন্য উর্দ্ধে আরোহণ করিতে থাকে, এবং সেই আশঙ্কায়ই বল যাহাই বল, গ্রাম, নগর, বহু বিস্তৃত প্রান্তর সকল কম্পিত হইতে হইতে ভূগর্ভে বিলীন হইয়া যাইতে থাকে; প্রকৃতির উপাসকেরা যতই অটল হউন না কেন, সে সময়ে আর তাঁহাদের আসন ঠিক থাকে না। সিসিলীর দুর্দ্দশা কোন্ উপাসকের মনকে না ব্যথিত এবং বিলোড়িত করিয়াছিল? আবার অন্যদিক চাহিয়া দেখ;—কোথায়ও কিছু নাই—আকাশ পরিষ্কার ছিল, সেই আকাশে ক্রমে ক্রমে মেঘ সঞ্চিত হইল, দেখিতে দেখিতে বায়ু প্রবলতর হইয়া উঠিল,—তার পর? ঝড়, বন্যা আসিয়া পৃথিবীকে ডুবাইতে বসিল। লোক স্রোতে ভাসিয়া চলিল,

হাহাকারে দিক পূর্ণ হইল! কোন্ প্রকৃতির উপাসক পূর্ব্ববঙ্গের অস্বাভাবিক জলপ্লাবনের সময় স্তম্ভিত না হইয়াছেন? জড় জগতে শক্তির যে প্রকার অপব্যবহার, মানব মনেও সেই প্রকার; কিন্তু কে ইহার গতিকে থামাইয়া রাখিতে সক্ষম? মনুষ্য যখন এই প্রকার শক্তির পরাক্রমের নিকট আত্ম-সমর্পণ করে, তখন তাহার ইচ্ছা বা অসক্তি সকল ডুবিয়া যায়। দুর্ভাগ্য বশতঃ এই মানবের হস্তে আবার ক্ষমতা ন্যস্ত হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই মানব আবার অন্যকে শাসন করিবার ভার গ্রহণ করে। মানবের ক্ষমতার অপব্য-বহারে এই ভারগ্রস্ত সংসার কম্পিত কলেবর ধারণ করিয়াছে। ভৃত্য প্রভুর ভয়ে কম্পিত, স্ত্রী স্বামীর ভয়ে সশঙ্কিতা, * শিষ্য গুরুর ভয়ে অস্থির, প্রজা রাজার ভয়ে বিলোড়িত, কৃষক জমীদারের ভয়ে বিষণ্ণ, নির্ধন ধনীর ভয়ে ব্যাকুল। কি মর্ম্মভেদী দৃশ্য!! তুরস্ক কেন আজ সশঙ্কিত? আমীর কেন আজ চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখিতেছেন? বাঙ্গলার কৃষকেরা কেন আজ মলিন! ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় কেন আজ অন্যায় শাসনে চিন্তিত! ভার-তের মিত্ররাজ্য সকল কেন আজ কম্পিত কলেবর ধারণ করিয়াছে? ভারতের লেখকের লেখনী কেন আজ নিশ্চল? এক কথায় ভারত কেন আজ অস্থির? যদি প্রকৃত মনুষ্য-তত্বজ্ঞ থাকেন, তবে তাঁহারা অবশ্যই বলিবেন,—মনুষ্যের ক্ষমতার অপব্যবহারের ভয়ে। বঙ্গদেশের কৃষক দিবারাত্রি জমিদারের ভাবনা চিন্তায় অস্থির;—কণ্ঠ শুষ্ক, মুখে কথা সরে না। * * * আবার ধর্ম্ম জগতের ইতিহাসও এই প্রকার দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ। বাস্তবিক মনুষ্য এত অপ্রা-কৃত জীব যে, ইহারা ঈশ্বরের সহিত ও সময়ে সময়ে তুলনীয় হইতে চায়!!

মনুষ্যের ভয়ে মনুষ্য কম্পিত, মনুষ্যের আশঙ্কায় মনুষ্য সশঙ্কিত; এই সকল বিষয় যখন ভাবি, তখন আর কথা ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা হয় না;—দিন রাত্রি বসিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে বাসনা হয়।

নীরব অভিনয়।

এক শ্রেণীর লোক বাহ্য জগতের চাকচিক্যময় আড়ম্বর এবং জাঁকজমক লইয়াই কৃতার্থ মনে করেন; তাঁহারা ভাষার উচ্চ শাব্দিকতাকে অভিনয়ের

* বঙ্গদেশের অন্ততঃ।

উৎকৃষ্ট ভাব মনে করেন, এবং অভিনেতৃবর্গের কুৎসিত অঙ্গ সঞ্চালন ও নানাপ্রকার বীভৎস রূপ ধারণকে অভিনয়ের জীবন মনে করেন। তাঁহারা মানবের অন্তর রাজ্যের দুর্নিরীক্ষ্য ইতিহাসের কাহিনী পাঠ করিয়া কখনও সুখ বোধ করেন না; কিম্বা মানবতত্ত্বের নিগূঢ় তত্ত্ব ভেদ করিয়া কখনও শোভার অলৌকিক রাজ্য সন্দর্শন করিয়া সুখ ও তৃপ্তি লাভে ইচ্ছুক হন না। এই শ্রেণীর লোকেরা নাট্যশালায় অভিনয় দর্শন করিবার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়া রজনীতে অভিনয় গৃহে লোকারণ্য সৃজন করে, এবং দিবসে সংসারের নিকট বিদায় লইয়া, আপনার চক্ষুকে আপনি আবরিত করিয়া রাখে। সংসারের লোকেরা এই শ্রেণীর লোকদিগকে দর্শক বা রসিক বলিয়া অভিহিত করে; এবং যাহারা বাতুলের ন্যায় অভিনয় মঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া কতপ্রকার অস্বাভাবিক শব্দে কিম্বা অঙ্গ চালনা দ্বারা লোক সমাজকে হাস্যাস্পদ করিতে একটুও সঙ্কুচিত হয় না, তাহাদিগকে অভিনেতৃ বলে; ও তাহাদিগের কুৎসিত শব্দ এবং অঙ্গ বৈলক্ষণ্যকে নাকি অভিনয় বলে। আমরা এ প্রকার অভি-নয়কে পিশাচের নৃত্য কিম্বা বাতুলের ক্রীড়া বলিয়া উপেক্ষা করি বা না করি, সে এক কথা, কিন্তু এ প্রকার অভিনয়কে প্রকৃত অনিভয় বলিয়া কখনও কৃতার্থ হই না।

তবে কি আমরা অভিনয়ের পক্ষপাতী নহি? অভিনয় ভিন্ন মানবের অস্তিত্ব আর কি! আমরা যখন বিশ্বনিয়ন্তার সৃজিত বিশ্বসংসার পানে তাকাই,—ক্ষণকাল একাগ্রচিত্তে যখন বাহ্যজগতের শোভা সৌন্দর্য্য, কীর্ত্তি-কলাপকে এক এক করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করি, যখন বাহ্য ইন্দ্রিয় এবং অন্তর ইন্দ্রিয়ের দুর্ভেদ্য দ্বার মুক্ত করিয়া নিবিষ্ট মনে মানবের অন্তর অধ্যয়ন করি; যখন দুঃখ, কষ্ট ও যন্ত্রণার বিলাপধ্বনি শ্রবণ করি, এবং একই সময়ে সুখ ও শান্তির উল্লাস হৃদয়কে ব্যথিত করে;—যখন জড় জগতের নানাপ্রকার আশ্চর্য্য শোভা সৌন্দর্য্য দেখি,—তখন এই বিশ্বকেই আমরা অভিনয়ের রঙ্গভূমি মনে করি। ঈশ্বরের এই রঙ্গভূমিতে সকলেই অভিনয় করিয়া থাকেন। এখানে ইতর ও উচ্চ শ্রেণীতে বৈষম্য নাই,—এখানে সকলের অধিকার সমান। কেহ হাসে, কেহ গায়, কেহ নৃত্য করে, কেহ দুঃখের মর্ম্মভেদী স্বরে অন্যকে ব্যথিত করে, কেহ বা উল্লাসের ভাবে সকলকে বিমোহিত করে; যথঃ মান এখানে সকলেই সঞ্চয়ে সমর্থ, এবং ইচ্ছানুসারে

সকলেই স্বার্থ চরিতার্থ করিয়া কৃতার্থ হয়। ভাবুক যিনি—যাঁহার যশের সহিত, মানের সহিত চিন্তাশক্তি বিসর্জ্জিত হয় নাই;—যাঁহার ধনের সহিত, এবং বাহ্য জগতের চাকচিক্যময় বিলাসের সহিত প্রতিভা হীনপ্রভ হয় নাই; তিনিই এই সকল অভিনয় দেখিয়া মোহিত হন; ও তিনিই অভিনয়ের যথার্থ সুখানুভব করেন। এই রঙ্গভূমিতে সকলেই অভিনেতা, ইহা বুঝিয়া তিনি হাসি কান্না, সুখ দুঃখ সকল ভুলিয়া ঈশ্বরের ভাবে বিমোহিত হইয়া যান।

অভিনয়ের আর একটী রাজ্য আছে, তাহা অতীব মনোহর, এবং তাহাই যথার্থ সুখপ্রদ। সেই অভিনয়ের ছায়া জগৎ সংসারে পতিত হইয়াছে বলিয়াই, দুঃখের ভীষণ আক্রমণের সময়েও, লোক বিশ্বপাতার রঙ্গভূমির অন্য অভিনেতৃগণের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া সান্ত্বনা লাভ করে। আমরা যে অভিনয়ের কথা বলিতেছি, তাহা নীরব অভিনয়। এ অভিনয়ের রাজ্যে শব্দ নাই, ভাষা নাই, আড়ম্বর নাই, লোকারণ্য নাই, সৌন্দর্য্য নাই, প্রকৃতির কৃত্রিমতা নাই;—অভিনয়ের এ এক আশ্চর্য্য রাজ্য। এস্থানে মানব শব্দ করিয়া অন্য মানবকে আকৃষ্ট করে না, এস্থানে ইন্দ্রিয় সুখের প্রত্যাশী হইয়া, কিম্বা বিলাসবৃত্তি চরিতার্থ করিবার মানসে দর্শকবৃন্দ সমবেত হয় না। সংসারের অর্থের সহিত এস্থানের অভিনয়ের সম্বন্ধ নাই,—এস্থানের দর্শকশ্রেণী নির্ধন হইয়াও ধনী, অভিনেতৃগণ পৃথিবীর সকল সম্পদ পরিত্যাগ করিয়াও এক বিপুল সম্পদের অধিকারী। পৃথিবীর ইতিহাসে এই শ্রেণীর অভিনেতৃগণের সম্পদের বর্ণনা দৃষ্ট হয় না;—বিদ্যার মহান্তরালে ইহার কাহিনী ও তত্ত্ব লাভ করা যায় না। ধনে এই সম্পদ কেহ ক্রয় করিতে সমর্থ নহে; যশ মানের উচ্চ সিংহাসনে বসিলেই কেহ এস্থানের সম্পদ ভোগ করিতে পারে না। এই আশ্চর্য্য নীরব অভিনয়ের চিত্র প্রত্যেক মানবের অন্তরে নিহিত থাকিলেও, তাহা নানাপ্রকার মলিনতায় আবৃত রহিয়াছে। এই অভিনয় ধর্ম্মসাধন। এস্থানের অভিনেতৃগণ যে সম্পদের অধিকারী,—সে বিপুল সম্পদ বিশ্বের অধিপতি পরমেশ্বর। ধর্ম্মপিপাসু সরল বিশ্বাসী যখন তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া দুর্ভেদ্য ও দুর্নিরীক্ষ্য মনোরাজ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করে, তখন সংসারের সকল আড়ম্বর নিবিয়া যায়; কিন্তু আর এক আশ্চর্য্য নীরব রাজ্য জ্ঞাননেত্রে পরিদৃষ্ট হয়। এ রাজ্যের শোভা সৌন্দর্য্য অপরিস্ফুট ভাষায় ব্যক্ত হয় না;—

লেখনী সে অভিনয়ের বর্ণনা করিতে সমর্থ নহে। ঈশ্বরের এই মনোহর রাজ্যে যাঁহারা সরল বিশ্বাসী হইয়া প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছেন,—তাঁহারাই নীরব হইয়া গিয়াছেন;—তাঁহারাই নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছেন। এ চিত্রের সৌন্দর্য্য, সংসারের কোন সুচিত্রকর আঁকিয়া দেখাইতে পারে না;—কোন সুবক্তা বাক্যাড়ম্বর করিয়া অন্যকে বুঝাইতে পারে না। বক্তা এস্থানে প্রবেশ করিলে, ভাষার দ্বার রুদ্ধ হয়; চিত্রকর এস্থানে প্রবেশ করিলে তাহার তুলিকা স্থির ভাব ধারণ করে; লেখকের লেখনী এস্থানে পরাস্ত হয়; কবির কবিত্ব এস্থানে পরাভব মানে। নীরব আড়ম্বর শূন্য ধর্ম্ম জগতে প্রবেশ করিয়া যাঁহারা ঈশ্বরের ভাবে ডুবিয়া যান, তাঁহারাই এসুখের অধিকারী; যশঃ, মান, স্বার্থ, অহঙ্কার, আত্মাভিমান, পাপ চিন্তা, প্রভৃতি বিসর্জ্জন দিয়া যাঁহারা তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হন, তাঁহারাই এ অভিনয় দেখিবার অধিকারী; কিন্তু ভাষা কি সেই নীরব জগতের সৌন্দর্য্য বর্ণন করিতে সমর্থ!!

এ সংসারে মৃত কে?

যাঁহার জীবনে মহত্ত্ব আছে, স্বদেশের উন্নতির আশায় যিনি অম্লান বদনে শত সহস্র স্বার্থ পরিত্যাগ করিতে পারেন, মৃত্যু শয্যায় শয়ান হইয়াও যিনি অন্যের চক্ষের জল মুছাইতে ব্যাকুল, পরিবর্ত্তনশীল সংসার, পরমাণুর রূপান্তর করিয়া, স্বীয় বলে এমন হিতৈষীর শরীরকে লুকায়িত করিতে পারে, তাহা আমরা আজ প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া অস্বীকার করিতে পারি না, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু সংসিদ্ধ করিতে কখনই সমর্থ নহে। সময়ের আবর্ত্তনে পৃথিবীর অধিকাংশ জীবের অস্তিত্ব অসময়ে বিলীন হইয়া যাইতেছে, তাহা আমরা জানি। মানবের ক্ষমতা হিংসা পরতন্ত্র হইয়া, কিম্বা আপন পশব্যভাব জগতে বিঘোষিত করিবার আশায়, কত জীবের প্রাণ সংহার করিতেছে, তাহা কে গণনা করিতে পারে? কিন্তু লোকের পতন, লোকের মৃত্যু নহে। সংসারে এমন অনেক মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা বহুকাল হইল, বাধ্য হইয়া সময় গহ্বরে আপন আত্মাকে লুকায়িত করিতে বাধ্য হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা অদ্যাবধিও অন্য হৃদয়ে সজীবের ন্যায় বিচরণ করিতেছেন। এসং-

সারে তাহারাই মৃত, যাহারা আপন শিক্ষায়, আপন চেষ্টায়, আপন দৃষ্টান্তে অন্যের হৃদয় ও মন বিলোড়িত করিয়া আপন মহত্ব তাহতে প্রতিষ্ঠিত করিতে অক্ষম ;—পৃথিবীতে সে জীবন ধারণ করিয়াও মৃত। আবার অন্যদিকে যাঁহার নাম স্মরণে অন্যের হৃদয়ে মুহূর্ত্ত মধ্যে কত আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, যাঁহার কথা মনে ভাবিলে সংসারে মনুষ্যত্ব লাভ করা যায়, তাঁহার শরীর ও প্রাণ এসংসারে থাকুক বা না থাকুক,—পৃথিবীর চক্ষে সে মৃত হইলেও প্রকৃত জ্ঞানীর হৃদয়ে সে কখনও মৃত নহে। আমরা এই যে কত পরিবর্ত্তন দেখিয়া দিন দিন নৈরাশ হইতেছি, আমাদের মধ্যে যদি প্রকৃত প্রস্তাবে কাহারও সেই প্রকার জীবনগত মহত্ব থাকে, তবে তাঁহার অসাময়িক পতন যতই দুঃখ উদ্দীপক হউক না কেন, অনন্ত কাল তাহার নাম জগতে বিঘোষিত হইবেই হইবে। এ আশা যদি আমাদের হৃদয়ে বলবতী না থাকিত তবে, আমরা পারিবারিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনে একেবারে ডুবিয়া যাইতাম ; এ আশা যদি আমাদের হৃদয়কে আশ্বাসিত না করিত, তবে আমরা নিশ্চয় ভাবী উন্নতি আশায় আজ জলাঞ্জলি দিতাম।

আজ আমরা এ সকল কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম কেন ? তাহার কারণ এই,—আমরা সংসারের লোক, একটু তরঙ্গ দেখিলেই ভয়ে কাঁপিয়া যাই, মনে কত নিরাশা উপস্থিত হয়। আমরা সংসারের লোক, কাহাকে মৃত দেখিলেই মন দুঃখে আচ্ছন্ন হয়। আমরা ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়া যতই মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করি না কেন, মন কিছুতেই শান্ত হয় না। * * * * * সংসারে অনেক লোক জন্মিয়াছে, অনেক লোক মরিয়াছে; কিন্তু প্রকৃত কীর্ত্তিবান লোক মরেন নাই ; তাঁহাদিগের কীর্ত্তি জীবিত রহিয়াছে। জগতের প্রকৃত হিতৈষী ব্যক্তিরা মরেন নাই। দাস ব্যবসায়ের উচ্ছেদকারী উইলবারফোর্স, সুবিখ্যাত পরহিতৈষী হাওয়ার্ড প্রভৃতির মৃত্যুতেও জীবন্ত ভাব বর্ত্তমান আছে। ধর্ম্মব্রত রক্ষার্থ যে সকল মহাপুরুষ প্রাণ দান করিয়াছেন, তাঁহারা এবং বীরবর নেপোলিয়ান মরিয়াও জীবিত রহিয়াছেন। ডিউক অব ওয়েলিংটন এ সংসারে যদি না থাকিবেন, তবে তাহার কথা স্মরণ করিয়া ইংলণ্ড আজ বীরমদে মত্ত হয় কেন ? ম্যাজিনী যদি মরিয়াই চিরজীবনের মত ইহলোক হইতে বিদায় লইয়া থাকিবেন, তবে আর ইটালীর মন তাঁহাকে স্মরণ করিয়া আজ উৎসাহিত কেন ? আমরা জানি বরার্ট এমেটের ন্যায় হিতৈষী, স্বাধীনতা প্রিয় শত সহস্র লোক বৈদেশিক

শাসন দণ্ডে অসময়ে জীবন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, কিন্তু বরার্ট এমেট কি আয়রলণ্ড-বাসীদিগের হৃদয়ে অদ্যাবধি ও জীবিত থাকেন নাই? তবে মৃত কে? জীবিতাবস্থায় যিনি মৃতের ন্যায় ব্যবহার করেন, জীবনান্তে প্রকৃত রূপে তিনিই মৃত। এরূপ ব্যক্তির মৃত্যুতে আক্ষেপের কোন কারণ থাকে না। আর যিনি জীবদ্দশায় জীবিতের ন্যায় কার্য্য করেন, মৃত্যুতেও তাঁহার জীবনের শেষ হয় না। তাঁহার নিজের জীবন অন্যের জীবনকে অনুপ্রাণিত করে।

রাজ শাসনের ভয়ানক আক্রমনের হাতে পড়িয়া আমাদিগের দেশের লোক অসময়ে মরিয়া যাইতে পারে, কারণ যাহা মনুষ্যের কার্য্য, তাহা পক্ষপাত শূন্য নহে; কিন্তু তাহাদিগের জীবনের মহত্ব কখন ও স্বদেশীর হৃদয় হইতে বিধৌত হইবে না। মানবের স্মৃতি মানবের এক অলৌলিক সম্পত্তি; এই সম্পত্তি আছে বলিয়াই ইটালী পূর্ব্ব মহত্মাদিগের নাম স্মরণে আবার সজীব হইয়া উঠিতেছে;—ফ্রান্স আবার ক্ষত দেহে অবিচলিত ভাবে অবিরাম প্রলেপ দিতেছে। মানবের স্মৃতি, মানবের এক মহাবল, কারণ উহা ভিন্ন মানব অতীত সময়ের মহত্ব স্মরণে, ক্ষীণ শরীরে, দুর্ব্বল মনে বল পায় না, উৎসাহ পায় না। ভারতবর্ষের স্মৃতি আছে বলিয়াই ভারত আজও রহিয়াছে; নচেৎ ইহা মরুভূমি হইয়া যাইত। ভারতে স্মৃতির পূজা আরম্ভ হইয়াছে বলিয়াই, আমরা ইহার ভবিষ্যত ইতিহাসে অনেক মঙ্গল নিহিত দেখিতে পাইতেছি। স্মৃতি ভিন্ন মৃত ব্যক্তি আর পরবর্ত্তী মানবের হৃদয়কে অনুপ্রাণিত করে না; স্মৃতি ভিন্ন মৃত ব্যক্তি আর অন্য জীবনে ক্রীড়া করিতে পারে না। আমরা এই স্মৃতির উপাসক হইয়া অবিচলিত ভাবে পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া ভাবী উন্নতির পথ অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হই। অন্যায় শাসনে সোমপ্রকাশের ন্যায় পতনে আমাদের উপকার ভিন্ন অপকার হইবে না।

ন্যায়ের সূক্ষ্ম পথ।

মানবজীবনের যাহা কিছু সুখকর, তৃপ্তিজনক, কষ্টসাধ্য, এবং শান্তিপ্রদ, তাহাই সাধন সাপেক্ষ। সাধনার পথে বিচরণ না করিয়া কেহই আপন অভীষ্ট সিদ্ধির স্থানে পৌছিতে পারেন না। রাজনীতির দুর্জ্ঞেয় এবং জটিল

কৌশলের ভিতরে যে সকল গূঢ়তত্ত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে, কাহার সাধ্য সাধনার পথে বিচরণ না করিয়া সে সকল গূঢ়তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবেন? আবার যাহা কিছু সাধন সাপেক্ষ, তাহাই সময় সাপেক্ষ,—ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় ভিন্ন সে সময় কর্ত্তন করিতে কেহই সক্ষম নহেন। কি ধর্ম্ম বিভাগ কি রাজনীতি বিভাগ, সকল বিভাগই সাধনার বশীভূত,—সকল বিভাগই সাধনার আয়ত্ত। এই পথ পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা অন্য পথে বিচরণ করেন, এই ভ্রমসঙ্কুল সংসারে আজ তাঁহারা ধার্ম্মিক বা রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু নিশ্চয় একসময়ে জগতের চক্ষু যখন প্রস্ফুটিত হইবে, তখন সকলই বৃথা আড়ম্বর ও জাঁকজমক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। পৃথিবীর ইতিহাস ভূয়ঃ ভূয়ঃ দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথার প্রমাণ দিতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। যাঁহারা নির্ব্বাক হইয়া ইতিহাস অধ্যয়নে জীবন সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমাদের কথা প্রমাণ শূন্য বোধ হইবে না।

ধর্ম্মবিভাগে যাহা কিছু সাধনার আয়ত্ত, তাহার মধ্যে ন্যায়ের পথ সর্ব্বাপেক্ষা দুর্গম এবং কঠোর। সাধক শ্রেণী ধর্ম্মের আর সকল অংশে জয়লাভ করিয়া এই স্থানে আসিয়া স্তম্ভিত এবং ভীত হইয়া পড়েন। যাঁহাদের বিবেক অত্যন্ত সমুজ্জ্বল ও বিবেচনা শক্তি তীব্র, তাঁহারা ভীত হইয়াও পথ পরিত্যাগ করেন না, কারণ বিবেক প্রভৃতি ন্যায় ভিন্ন থাকিতে পারে না।

এই স্থানে আসিয়া তাঁহারা কঠোর হন, ধর্ম্মের কোমলভাব দূরে পলায়ন করে। ন্যায়ের রাজ্যে কেবল কঠোরতা বিদ্যমান। যাঁহারা ন্যায়ের সাধক, তাঁহাদের জীবন কঠোর, ভীষণ এবং ভয়সঙ্কুল। এই সাধক শ্রেণীর অস্তিত্ব এই সংসারে আছে বলিয়াই, পৃথিবী অত্যাচার, পাপ তাপে পরিপূর্ণ হইয়াও আজও রহিয়াছে। এই সাধক শ্রেণীর নাম এইক্ষণ পর্য্যন্তও মানব মনে ভয় সঞ্চার করে বলিয়া আজও মানবের অন্তরে পাপের প্রতি ঘৃণা বিদ্যমান রহিয়াছে। সকল প্রকার সাধক অপেক্ষা আমরা ন্যায়ের সাধককে উচ্চ স্থানে দেখিয়া থাকি।

এই দুর্ব্বল চিত্ত মানব, সংসারে থাকিয়া যত প্রকার যুদ্ধে জয় লাভে সমর্থ হউক না কেন, এই ন্যায়ের পথে জয় লাভ করা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। এখানে মানবের ভালবাসা সময় সময় বিসর্জ্জন দিতে হয়; এ পথে কর্ত্তব্যের অনুরোধে মানবের মুখশ্রী ভুলিয়া যাইতে হয়। আপন পর এ পথে সমান

জ্ঞান, বন্ধু বান্ধব এবং শত্রু এ পথে এক হইয়া যায়। এ পথে মিত্রকে শত্রুবৎ ব্যবহার করিতে হয়; শত্রুকে মিত্র বলিয়া আলিঙ্গন করিতে হয়। মোট কথা, এ পথের লক্ষ্য কেবল বিবেকের অনুরোধ পালন,—এ পথের সার সম্বল কেবল কর্ত্তব্য জ্ঞান ও বিবেচনা শক্তি। এই সংসারে যাঁহারা এ পথে অটল থাকিতে পারেন, তাঁহাদের পদ আর কোথায়ও স্খলিত হইতে পারে না; যাঁহারা এই পথে জয়লাভ করিতে পারেন; সংসারের সকল প্রকার যুদ্ধে জয় লাভ তাঁহাদিগের নিকট নিতান্ত সহজ হইয়া পড়ে।

কে বলে মানবের অস্তিত্ব স্বচ্ছ দর্পণে প্রতিবিম্বিত ছায়াবৎ ক্ষণস্থায়ী? কে বলে মানব জীবন দুর্ব্বলতার আধার? যিনি ন্যায়পরায়ণ, তাঁহার জীবনের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া আমরা আর এ কথা বলিতে পারি না। ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির অস্তিত্ব অচিন্ত্যকাল স্থায়ী,—সময়ের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন এপ্রকার মানবের অস্তিত্ব বিলোপ করিতে পারে না। মানবের মুখে মুখে,—বিবেকের অপরিস্ফুট স্তরে স্তরে এ প্রকার মানবের অস্তিত্ব বিদ্যমান রহিয়া যায়। ন্যায় পরায়ন ব্যক্তির শরীর দুর্ব্বল হইলে হইতে পারে, কিন্তু চিরকাল তাঁহার উজ্জ্বল নয়নের প্রতি চাহিয়া সকল সবল মানব বলহীনতা স্বীকার করে; নিশ্চয় সকল প্রকার পাশব বল এ প্রকার বীরের নিকট পরাস্ত স্বীকার করে। এসংসারে যদি কিছু সুখকর স্থান থাকে, যাহার অবলম্বনে দুর্ব্বল মানব সবল হয়, তবে সে স্থান ন্যায়ের পথ। এই পথে বিচরণ করিতে করিতে যখন সাধক আপন আসন স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, তখন এসংসার তাঁহার নিকট কেবল সুখের বলিয়া বোধ হয়। সে স্থানের বায়ু এত পরিষ্কৃত যে, সংসারের পক্ষপাতিতা এবং নানা প্রকার আত্মার অপকৃষ্ট আভরণ সে বায়ু স্পর্শে পবিত্র হইয়া যায়। যদি আমাদিগের দেশের কোন সম্প্রদায় ধর্ম্মের সাধক হইতে অভিলাষী হইয়া থাকেন, তবে সকল ছাড়িয়া এই কঠোরতর সাধনের পথে উপস্থিত হউন;—যদি জীবনের মঙ্গল এবং স্বদেশের উন্নতির অভিলাষী হইয়া থাকেন, তবে নীরবে শত্রুকে মিত্র জ্ঞান এবং মিত্রকে সময় হইলে শত্রু মনে করিয়া ন্যায়ের পথের সাধক হউন। তাঁহাদিগের সকল মনস্কামনা পূর্ণ হইবে; আর বৃথা আড়ম্বরে বিচরণ করিতে হইবে না।

বাঙ্গালীর জীবন এত অনুন্নত কেন ?

অনেকেই অনুমান করিয়া থাকেন, পূর্ব্বের অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে, ইহা বোধ হয় যে, বাঙ্গালীর জীবন ক্রমশঃই উন্নতির সোপানে উঠিতেছে। বাহিরের আড়ম্বরই যদি মানব জীবনের প্রকৃত উন্নতির লক্ষণ হয়, তাহা হইলে আমরাও এ কথা অস্বীকার করিতে পারি না। আন্দোলনের মধ্যে বাঙ্গালী অঙ্গ দোলাইয়া নৃত্য করিতে শিখিয়াছে, একথা কোন ক্রমেই আমাদিগের অস্বীকার করিবার যো নাই। সামান্য পল্লিগ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া প্রকাণ্ড নগর পর্য্যন্ত আমরা একথার সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারি। সামান্য গ্রামে প্রবেশ করিয়া দেখিলে, ইহা সহজেই অনুভব করা যায় যে, সকলের জীবনের লক্ষ্যই নীরবে অর্থসংগ্রহ এবং তৎসাধনার্থ যে প্রকার কার্য্যই হউক না কেন, তাহা করিয়া জীবনকে সার্থক জ্ঞান করা। স্বীয় পরিবার পালন ভিন্ন অন্য কর্ত্তব্য মানবের থাকিতে পারে কিম্বা আছে, এ কথা গ্রামের সহস্র লোকের মধ্যে একজন বুঝেন না; তবে যে কেহ কেহ পর উপকারার্থ মধ্যে মধ্যে চেষ্টা করিয়া থাকেন, সে কেবল কুসংস্কারাবৃত মনের দুর্ব্বলতার ফল মাত্র; বাস্তবিক ধর্ম্মরাজ্যে আশু পুরস্কারের আশা না থাকিলে গ্রামের অতি অল্প লোকই সৎ কার্য্যের অনুষ্ঠানে রত হইতেন। গ্রামের সকলই নিস্তব্ধ; কিন্তু বাদ বিসংবাদ, ঝগড়া বিবাদের সময় যে প্রকার উৎসাহ ও উদ্যম দেখা যায়, তাহাতে বোধ হয় যেন সকলেই প্রকৃত কার্য্যক্ষম লোক। গ্রামবাসীদিগের দলাদলী কিম্বা কাহাকেও অপদস্থ করিবার সময় যে প্রকার উৎসাহ ও উদ্যম বৃদ্ধি হয়, তাহা যদি সমস্ত জীবনে কার্য্য করিত, তবে যে প্রকারেই হউক, বঙ্গবাসীদিগের জীবন কিছু রূপান্তর ধারণ করিত, সন্দেহ নাই। নগরে প্রবেশ কর। বাঙ্গালীর কলেজে অধ্যয়ন, স্কুলের পাঠ অভ্যাস, এ সকল ভাবিলে সকলের মনেই আশা হয়, কোন দিন ইহারা প্রকৃত মনুষ্য হইয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে। কিন্তু সে আশা কেবল সৈকতময় বালির বাঁধের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী এবং অমঙ্গলের হেতু। কলেজের সহিত বাঙ্গালীর অধ্যয়ন শেষ হইয়া যায়, এই কারণেই বাঙ্গালীর জীবন অন্যান্য দেশবাসীদিগের জীবন হইতে এত অনুন্নত রহিয়া যায়। অনেক সময় দেখা গিয়াছে এক শ্রেণীতে পাঠ করিয়া ইংরাজেরা প্রায়ই বাঙ্গালীদিগকে পশ্চাৎবর্ত্তী করিতে সক্ষম হয় না।

কিন্তু আর ২০ বৎসর পরে সেই বাঙ্গালী জীবনের সহিত সেই সাহেবের জীবনের তুলনা কর, দেখিবে সে স্থলে সাহেব এক জন দেবতা, বাঙ্গালী যেন নরকের কীট। এই প্রকার ঘটনা আমরা প্রায়ই দেখিয়া থাকি। বাঙ্গালীদিগের উৎসাহ ও উদ্যম কেন চিরস্থায়ী হয় না, তাহার কারণ আমরা আজ পর্য্যন্তও আবিষ্কার করিতে সক্ষম হই নাই। তবে এই মাত্র বুঝিয়াছি, আড়ম্বরই বাঙ্গালী জীবনের সার সম্বল। সভায় বক্তৃতা কালে সকল যুবকই দেশহিতৈষী। অন্যের নিকট মর্য্যাদা লাভ করিবার সময় সকলেই নীতি পরায়ণ, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদিগের মনের ভাব আজ পর্য্যন্তও সে প্রকার হয় নাই। অভাব পরিজ্ঞাত না হইলে কখনও লোক সেই অভাব দূর করিতে পারে না, ইহা যেমন স্বাভাবিক; সেই প্রকার মনের সহিত বাহিরের কার্য্যের সামঞ্জস্য না থাকিলেও লোক উন্নত হইতে পারে না। বঙ্গদেশের ধর্ম্মসমাজে, কি রাজনীতির পর্ণকুটীরময় প্রান্তরে, আমরা কেবল আড়ম্বরের চিহ্ন দেখিয়া দেখিয়া জ্বালাতন হইতেছি। বঙ্গদেশের লোক কথা বলিতে চায় তখন, যখন কার্য্যের বহু বিলম্ব অনুভব করিতে পারে; অর্থাৎ তাহারা অনেক স্থলে কথা এবং কার্য্যকে পাশাপাশী দেখিলে দূরে গমন করে। রাজনীতির আন্দোলনই বল, কি ধর্ম্মনীতির কথাই বল, যন্ত্র সম্বন্ধীয় আইন প্রচলনের পর যে প্রকার উৎসাহ দেখিয়াছিলে, আজ কাল কি আর সে প্রকার উৎসাহ দেখিতে পাও? ভাই বঙ্গবাসি! পৃথিবীর ইতিহাস পড়, দেখিবে বৎসরের পর বৎসর কোথায় চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু প্রকৃত সাধক যাঁহারা, তাঁহাদের মন বিচলিত হইতেছে না। তাঁহারা যিনি যে বিষয়ের তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছেন, তিনি সেই বিষয় লইয়া নীরবে পড়িয়া আছেন, পৃথিবী হয়ত তাঁহাদের অস্তিত্বও অনুভব করিতে পারিতেছে না, কিন্তু এমন সময় নিশ্চয় আসিবে যখন তাঁহারা সিদ্ধ হইবেন। আড়ম্বরের মধ্যে নৃত্য করা কিম্বা ঘুরিয়া বেড়ান প্রকৃত মনুষ্যত্ব নহে। মন্ত্র পরিগ্রহ করিয়া তাহাতে সিদ্ধ হওয়াই মনুষ্যত্ব। এ সংসারে যশ ও মান প্রাপ্ত হওয়া অধিক কষ্টের কথা নহে; কিন্তু সেই মান রক্ষা করাই কঠিন। বাজারে ঢাক বাজান অতি সহজ কথা; কিন্তু সেই বাদ্য দ্বারা জয় লাভ করা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে; এই কথা যে দিন বঙ্গদেশের সকলের হৃদবোধ হইবে, সে দিন বাহ্যিক আড়ম্বর না থাকিলেও, আমরা অন্তরের আগুনের অস্তিত্ব অনুভব করিতে

পারিব। টাউনহলের সভায়, যন্ত্র সম্বন্ধীয় আইন প্রচলিত হইবার পরে যাইয়া যদি আমরা একটী প্রাণীকেও না দেখিতে পাইতাম, তাহাতে আমাদের তত দুঃখ হইত না, যদি অন্তরে প্রকৃত বিরক্তির চিহ্ন আমরা দেখিতে পাইতাম। সে বিরক্তি কেবল কথায় আবদ্ধ নহে। যে বিরক্তিভাব মানবের অভাব প্রকাশক, এবং যাহা একবার মনুষ্যের জ্ঞানের অধীনে আসিলে আর মানব চুপ করিয়া থাকিতে পারে না, আমরা সেই অভাব প্রকাশক বিরক্তির কথাই বলিতেছি। বঙ্গবাসীর মন যতদিন কেবল বাহ্যিক আমোদ প্রমোদ, বাহিরের আন্দোলন লইয়া থাকিতেই সুখবোধ করিবে, ততদিন বাস্তবিক ইহাদের জীবনের উন্নতির আশা করা যায় না। যখন সকল প্রকার সার শূন্য আড়ম্বর থামিয়া যাইবে, যখন যশের আশায় কিম্বা ক্ষণস্থায়ী মর্য্যাদার জন্য লোক নৃত্য করিবে না দেখিব, সেই দিন আমরা বঙ্গবাসীর হৃদয়ে আগুনের অস্তিত্ব অনুভব করিব, এবং সেই দিন বুঝিব এই আগুন প্রজ্বলিত হইয়া সময়ে বঙ্গদেশে মনুষ্যত্বের গৌরব রক্ষা করিবে।

শিক্ষা।

পৃথিবীতে সকলেই শিক্ষার্থী, কিন্তু প্রকৃতরূপে কেহই শিক্ষিত নহে। মানবের প্রাণ শিক্ষা,—মানবের অস্তিত্ব কল্পনা করিলে আমরা কেবল শিক্ষাই অস্তিত্বের মূল উদ্দেশ্য বলিয়া উপলব্ধি করি। কিন্তু যে শিক্ষা মানবের মূল উদ্দেশ্য বলিয়া প্রতীত হইল, এ শিক্ষার আদি অন্ত কোথায়? শিক্ষার আদি নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, কিন্তু অন্ত নির্ণয় করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে; শিক্ষার সীমা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শরীর বিশিষ্ট মনুষ্যের অস্তিত্ব ক্ষণস্থায়ী,—এই আছে এই নাই,—যেন বিদ্যুৎবৎ পরিলক্ষিত হয়; এই শরীর বিশিষ্ট মানব দুদিন চারিদিনের কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র এই সংসারে লীলা খেলা করে; ইহার মধ্যে অনন্ত বাহ্য জগৎ এবং অনন্ত অন্তর জগতের কি শিক্ষা করিতে পারে? সংখ্যা বা পরিমাণের তুলনায় কিছুই পারে না। অনেকে মনে বলিয়া থাকেন, মানব দুদিন দশদিন পরেই যখন সময় সাগরের তরঙ্গে মিলাইয়া যায়, তখন আর শিক্ষার অন্ত নির্ণয় করা কষ্ট-

কর কি ? আমরা মৃত্যুকে শিক্ষার শেষ মনে করি না ;—আমরা বিশ্বাস করি মানব আত্মা অনন্ত শক্তির বিন্দুমাত্রের অধিকারী হইয়াও অনন্তকাল শিক্ষা করে। যে শিক্ষা মানব অস্তিত্বের প্রথম দিন, অর্থাৎ জরায়ু হইতে শরীর ধারী হইয়া পৃথিবী সন্দর্শনের দিন হইতে মানবকে আলিঙ্গন করে, সে শিক্ষা মানবের চির সহচর,—চির ভূষণ, ইহার শেষ নাই, ইহার বিরাম নাই। এ চির শব্দের অর্থ সংসার ব্যাপক নহে, এ চির শব্দ অনন্ত কাল ব্যাপক ; মানব যাহা কল্পনা করিতে পারে না, মানব যাহা ধারণা করিতে অক্ষম, এ চির শব্দ তাহাই। যাঁহারা অপরিস্ফুট ভাষার সাহায্যে অনন্ত জগতের অনন্ত সৌন্দর্য্য বর্ণনে প্রবৃত্ত, তাঁহাদের সকল ক্ষমা করা যাইতে পারে, কিন্তু ভাষার জটিলতা ভেদ করিয়া তাঁহাদের মনোগত ভাব হৃদয়ঙ্গম করিবার সময় আর তাঁহাদিগকে ক্ষমা করা যায় না।

আমরা যে শিক্ষাকে মানবের চিরসঙ্গী বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম, এ শিক্ষা কি ? এবং ইহা কেনই বা মানবের সহিত এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ ? যাঁহারা শিক্ষাকে ইন্দ্রিয়াধীন মনে করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের ঐকমত্য নাই ; কারণ ইন্দ্রিয়াধীন যে শিক্ষা, সে ইহ জগতের শিক্ষা,—সে কেবল বাহ্য জগতের শিক্ষা এবং সে শিক্ষা মৃত্যুতেই, অর্থাৎ শরীরের সহিত যখন মানবের বিচ্ছেদ হয়, তখনই তাহা মানবকে পরিত্যাগ করে। আমরা শিক্ষাকে ইন্দ্রিয়াধীন মনে করি না। তবে এই বাহ্য জগতের দুর্ভেদ্য পংক্তির মধ্যে অণুপ্রবেশ করিলে আমরা দেখিতে পাই,—সংসারে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মানব ইহ সংসারের অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারে ; এবং ইহাও সময়ে সময়ে সন্দেহের মীমাংসার বিষয় যে, ইন্দ্রিয় না থাকিলে মানব পৃথিবীর পরিজ্ঞাতব্য বিষয় জ্ঞাত হইতে পারিত না। যাহাই হউক, সে অন্য কথা ; কিন্তু এ শিক্ষা কি ?—শিক্ষাকে আমরা মানসিক শক্তি নিচয়ের বিকাশ ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারি না। মানবের মধ্যে কতকগুলি শক্তি আছে,—যাহাতে মানবকে সৃজিত প্রায় সকল প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়াছে ; সেই শক্তি সকলের জীবন শিক্ষা, ইহা ভিন্ন মানবে আর পশুতে কোন বিভিন্নতা নাই। কারণ যে শক্তি নিচয়ের জন্য মানব শ্রেষ্ঠ জীব, সেই শক্তিনিচয়ের জীবনই শিক্ষা ; শিক্ষার অভাবে সে শক্তি সকল হীন জ্যোতিঃ বিশিষ্ট পাশব শক্তির ন্যায়,—তাহা কখনও মানবকে পশুর শ্রেণী হইতে উর্দ্ধে রাখিতে সক্ষম

নহে। এই শিক্ষাই মানব, এই শিক্ষাই মনুষ্যত্ব,—এই শিক্ষাই মানবের সকল, এবং এই শিক্ষার সাহায্যেই মানব সমগ্র সৃষ্ট জীবের উপর আধিপত্য করে। মনুষ্য বলিলে আমরা ইহাই বুঝি,—ইহা কেবল কতকগুলি শক্তির ভাণ্ডার—এবং শিক্ষাই সে শক্তির প্রাণ। মনুষ্য বলিলে, যাঁহারা হস্ত পদ বিশিষ্ট প্রাণীর অস্তিত্ব অনুভব করেন, ইহা ঠিক কথা, যে তাঁহারা মৃত্যুকেই মনুষ্যের শেষ মনে করিবেন, এবং শিক্ষাকেও ইন্দ্রিয়াধীন পুস্তকের কাহিনী বিশেষ বলিয়া মনে করিবেন; এবং তাঁহাদের শিক্ষার অন্ত নির্ণয় করাও কঠিন নহে। কিন্তু আমরা মনুষ্য বলিলে কেবল হস্ত পদ বিশিষ্ট জীব মনে করি না;—হস্ত পদ না থাকিলেও মানব সে, যাঁহার মধ্যে কতকগুলি শক্তির অস্তিত্ব আছে। আমরা মানবের সহিত শিক্ষার যে সম্বন্ধ নির্ণয় করিলাম, ইহা কখনও দুই চারি দিনের জন্য হইতে পারে না। যাঁহারা ভাবুক,—যাঁহারা চিন্তাশীল,—তাঁহারা আমাদের কথার গূঢ়তত্ত্ব অনায়াসেই ভেদ করিতে পারিবেন।

শিক্ষার কতকগুলি সহায় আছে;—অপেক্ষাকৃত সভ্য সমাজে সেই সহায় গুলির সংখ্যা অধিক, তজ্জন্যই তাঁহারা অপেক্ষাকৃত অধিক শিক্ষিত, ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার যো নাই। কিন্তু আমরা যাহাকে শিক্ষা বলি, তাহা সমগ্র মানব জাতির মধ্যেই আছে। যাহারা পৃথিবীতে জঘন্য, অপদস্থ, ও অসভ্য বলিয়া অভিহিত,—যাহাদের জ্ঞান এখনও সভ্য সমাজের জ্ঞানকৌশল অতিক্রম সমর্থ হয় নাই, যাহাদের মানসিক শক্তি এখনও সম্যক বিকশিত হইয়া পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত জাতির সমকক্ষ হইতে পারে নাই; তাহারাও এ শিক্ষার অধিকারী, এবং আমরা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিয়া থাকি, শিক্ষিত হইতে হইতে এক দিন তাহারা ও সভ্য সমাজের সমকক্ষ হইতে পারিবে। এ বিশ্বাস আমাদিগের অন্তরে না থাকিলে আমরা শিক্ষার সূত্রকে টানিয়া আরো সীমাবদ্ধ স্থানে আবদ্ধ করিতে যত্নবান হইতাম।

পৃথিবীতে একশ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা পুস্তকগত বিদ্যাকে অভ্যস্ত করার নাম শিক্ষা বলেন। শতাব্দী হইতে বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত যে সকল রত্ন মানব কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে যে মানবের শিক্ষাকে উন্নীত করে, তাহা আমরাও স্বীকার না করি এমত নহে; কিন্তু

আমরা উহাকে শিক্ষার একটী সহায় ভিন্ন আর কিছুই মনে করি না; বরং ইহা স্পষ্ট ভাবে বলি যে, পুস্তকে যে সকল রত্ন সংগৃহীত হইয়াছে, মানব আপন ক্ষমতায় সকল সময়েই সে সকল লাভে সমর্থ; আমরা বলি এজগতে পুস্তক প্রচারিত না হইলে হয় ত আজ আমরা বিনা পরিশ্রমে শিক্ষা লাভ করিতে পারিতাম না, কিন্তু একেবারেই শিক্ষিত হইতাম না, এ কথা বিশ্বাস করি না। অবিশ্বাসী যাঁহারা,—যাঁহারা মানবের শক্তি-নিচয়ের চিরউন্নতি-শীলতা স্বীকার করেন না, যাঁহারা পরকালে বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা এ প্রকার কথা বলিতে পারেন যে, পুস্তক না থাকিলে লোক সমাজ শিক্ষিত বা উন্নত হইত না। যে শিক্ষা অন্ত শূন্য, আমরা সে শিক্ষাকে পুস্তকগত বিদ্যায় পরিণত করিতে কখনও ইচ্ছা করি না। আমরা বলি সংসারের যে স্থানে কখনও কোন পুস্তক প্রচারিত হয় নাই, সেখানে লোক শিক্ষা পায়। দার্শনিকই বল, বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতই বল, সকলেই পুস্তকগত বিদ্যা অভ্যস্ত করিয়া কৃতীত্বলাভ করে না। আমরা বলি শিক্ষার কোন নির্দ্দিষ্ট পুস্তিকা নাই;—ইহা অনন্ত আকাশের ন্যায়, বিশ্বের অতীত স্থান পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত; নক্ষত্র জগতের দুর্নীরিক্ষ্য ও দুর্জ্ঞেয় কাহিনী হইতে ইহ সংসারের অদৃশ্য এবং অনমুমেয় পরমাণুর পটলে পটলে শিক্ষার রাজ্য বিস্তৃত। মানবের সম্মুখে ইহ সংসারের নানা প্রকার সৃষ্ট জীব জন্তু, অণু পরমাণু, এবং পরকালের অদৃশ্য অন্ধকারময় স্থানের কল্পনাতীত জীবের অস্তিত্ব মানবের শিক্ষার প্রশস্ত ক্ষেত্র। এ ক্ষেত্র ছাড়া কোন মানব থাকিতে পারে না। ইচ্ছা করিয়াও শিক্ষার পরাক্রম কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। মানব ইচ্ছা করিয়া পুস্তকের পৃষ্ঠা উদ্ঘাটন করুক বা না করুক; পৃথিবী, এবং পৃথিবীর পর অনন্ত জগৎ আপনার পৃষ্ঠা উদ্ঘাটন করিয়া পংক্তির পর পংক্তি মানবের জ্ঞানের নিকট উপস্থিত করিয়া তাহাকে শিক্ষা দিতে প্রস্তুত। মূল কথা—লোক ইচ্ছা করুক বা না করুক ইহ সংসার, এবং ভবিষ্যতে যাহা হইবে, তাহা অনবরত মানবকে শিক্ষা দিবেই দিবে। শিক্ষার হাত ছাড়া কেহই নহে। বায়ু যেমন মানবের শরীরের জীবন, শিক্ষা সেই প্রকার মানসিক শক্তির জীবন। বায়ুর অস্তিত্ব হইতে কেহই যেমন পলায়ন করিতে পারে না, সেই প্রকার শিক্ষার রাজ্য হইতেও কেহই নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। ইহা বায়ু হইতেও বিস্তৃত, কারণ বায়ুর সহিত কেবল শরীরের সম্বন্ধ, বায়ুর সহিত

কেবল সংসারের সম্বন্ধ। মানবের মন যেখানে, সেখানেই শিক্ষার উপায়; ইহা পড়িয়া কেহই শেষ করিতে পারে না, ইহা অভ্যস্ত করিয়া কেহ সীমাবদ্ধ করিতে পারে না। শিক্ষার কি বিশ্বব্যাপী আশ্চর্য্য পরাক্রম! ইহা ভাবিলে হৃদয় চমকিত হয়; মন বিস্ময়ে ডুবিয়া যায়; মানবের অপকৃষ্ট আভরণ জ্যোতিঃ বিহীন হইয়া মানবকে একেবারে অবনত করিয়া তুলে।

আমরা শিক্ষার যে অনন্ত বিস্তৃত রাজত্বের কথা বলিলাম, ইহাকে কে আপনার ক্ষমতায় আয়ত্ত করিতে সক্ষম? আর শিক্ষার পদার্থ নাই, এ কথাই বা কোন্ অহঙ্কারী মানব বলিতে পারেন? আমি প্রকৃত শিক্ষিত হইয়াছি, পৃথিবীতে যাহা কিছু জানিবার সকল জানিয়াছি, এবং ভবিষ্যতে যাহা কিছু জানিতে হইবে, তাহাও হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, একথা কি কেহ বলিতে পারেন? প্রকৃত শিক্ষার্থী যাঁহারা,—যাঁহারা শিক্ষার জন্য আপনার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া যান, তাঁহারা কখনও বলিবেন না। তাঁহারা বলিবেন, শিক্ষায় আসক্তি আছে, কিন্তু পরিতৃপ্তি নাই, তাঁহারা বলিবেন শিক্ষায় অনন্ত তৃষ্ণা, কিন্তু শান্তি নাই; তাঁহারা বলিবেন শিক্ষায় মনের এক প্রকার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়, কিন্তু তাহা নিবারিত হয় না।

প্রকৃত শিক্ষায় বিনয় আছে, কিন্তু অহঙ্কার নাই; যাঁহারা শিক্ষার্থী, তাঁহাদের আত্মা বিনীত; তাঁহাদের মুখে কথা সরে না, উচ্চ কথা বাহির হয় না; মস্তক অবনত, হস্ত নীরব, সকল নীরব, কারণ শিক্ষার বিস্তৃত ক্ষেত্র পানে যখন তাঁহারা চাহিয়া দেখেন, তখন মনে করেন, কিছুই হইল না, কিছুই হইল না। মুহূর্ত্ত যায়, সপ্তাহ যায়, মাস যায়, বৎসর যায়, শতাব্দী যায়, তবুও শিক্ষার রাজ্য অতিক্রম করা যায় না। শিক্ষা করিতে করিতে সংসারের আসক্তি যায়, ভালবাসা যায়, শরীরের বল যায়, মনের উৎসাহ যায়, জীবন যায়, মৃত্যু মানবকে আলিঙ্গন করে, তবুও শিক্ষার তৃষ্ণা নিবারিত হয় না; কি ভয়ানক তৃষ্ণা!! কি অপরিসীম রাজত্ব!!!

আন্দোলন ও কার্য্যে পরিণতি।

উনবিংশ শতাব্দী, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে উন্নতির দ্বার যে প্রকার প্রশস্ত-ভাবে মুক্ত করিয়াছে, ভারতবর্ষের প্রতি তাদৃশ কারুণ্য দৃষ্টি না করিয়া থাকিলেও, ইহা স্মরণ করা আমাদিগের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে, অল্প সময়ের আন্দোলনেই প্রচুর পরিমাণে ফল দর্শিতেছে। নিশ্চেষ্ট ব্যক্তি-গণ চিরকালই চিৎকার করিয়া থাকেন যে, যেখানে কার্য্যের সম্ভাবনা নাই, সে পথে কখনও পদনিক্ষেপ করা বিধেয় নহে; আন্দোলনের পূর্ব্বেই তাঁহারা কার্য্য দেখিতে বাসনা করেন; কিন্তু আমরা চিরকাল বিশ্বাস করিয়া আসি-য়াছি, প্রথম আন্দোলন তারপর তাহার ফল, অর্থাৎ কার্য্য। আন্দোলন ব্যতীতও যে সময় সময় কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা আমরা অস্বীকার করি না; বরং তাহারই আমরা অধিক পক্ষপাতী। কিন্তু তাই বলিয়া, বলিতে সঙ্কুচিত হই যে আন্দোলনের ফল কখনও ভাল হয় না। যেমন তণ্ডুল তুষের মধ্যে সুরক্ষিত হইয়া থাকে;—আন্দোলনের মধ্যে সেই প্রকার কার্য্য লুক্কায়িত থাকে। আন্দোলন চাই—নচেৎ কার্য্য রূপ তণ্ডুলের প্রত্যাশা নাই। কিন্তু যেখানে আন্দোলন তণ্ডুল শূন্য তুষের ন্যায়, সার শূন্য, মহত্ব শূন্য; সে আন্দোলন কখন ও উপকারী নহে। ভারতবর্ষে এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা কাল্পনিক অংশ পরিত্যাগ করিয়া কেবল কার্য্য দেখিতে বাসনা করেন; ভারতবর্ষ আশানুরূপ সেই প্রকার উন্নত হইলে আজ আমরা তাঁহাদিগের কথায় সায় দিতাম কি না, জানি না; তবে এই মাত্র জানি এইক্ষণ ভারতবর্ষ যে প্রকার অবস্থায় রহিয়াছে, ইহাতে নিশ্চয় কল্পনার প্রয়োজন। কাল্পনিক ভাবে নিশ্চেষ্ট মানবকে সময়ে সময়ে যেমন অকর্ম্মণ্য করিয়া থাকে, সেই প্রকার সময়ে সময়ে উৎকৃষ্ট ফল প্রসব করে। কয়েক বৎসর হইতে ভারতবর্ষে কল্পনার স্রোত, ভাবের স্রোত, কথার স্রোত ও আন্দোলনের স্রোত এত প্রবলতর বেগে বহিয়া গিয়াছে, এমন কি আজও বহিতেছে, যে সাময়িক বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কার্য্য না দেখিযা একেবারে উদাসীন হইয়া গিয়াছেন;—ভাবিতেছেন এ দেশের আর কিছু হইবে না। আমরা চিরকাল বলিয়া আসিয়াছি,—নিদ্রিত লোককে নিদ্রা হইতে জাগরিত করিতে হইলে, শব্দ চাই; কিন্তু মানবের

যখন নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়, তখন আর শব্দের আবশ্যকতা থাকে না। ভারত-বাসীগণ, সকলে না হইলেও, অধিকাংশই নিদ্রিত; তাঁহাদিগকে নিদ্রা হইতে জাগরিত করিবার জন্য সভা, বক্তৃতা, আন্দোলন, তর্ক বিতর্ক সকলেরই প্রয়োজন, কারণ তাহা ভিন্ন তাঁহাদিগকে কে জাগরিত করিবে? ভারতের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত নিদ্রার প্রবল পরাক্রম বিদ্যমান; এমন সময়ে কে কথা না কহিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে? তজ্জন্যই আমরা দেখিতে পাই-তেছি এই কয়েক বৎসর হইতে ভারতে একটী ধ্বনি উঠিয়াছে, সে ধ্বনি ভাল কি মন্দ, তাহা কার্য্য না দেখিলে কে বলিতে পারে? আমরা কার্য্য না দেখিয়া কোন কথা বলিতে সাহস করি না। ভারতের অনেক ব্যক্তি সে ধ্বনি শ্রবণ করিয়া কত ঠাট্টা বিদ্রুপ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই; কিন্তু আমরা কোন কথা বলি নাই, তার অর্থ এ নহে যে আমরা কার্য্য ছাড়িয়া কল্পনা বিস্তৃত হইতে দেখিলে অধিক সুখী হই। কিন্তু তার অর্থ অত্যন্ত সারযুক্ত; আমরা জানি মানবকে প্রস্তুত না করিলে কখনও মানব কার্য্যের জন্য লালায়িত হয় না। অগ্নিকে বায়ুর পরাক্রমে উত্তেজিত না করিলে, যেমন অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া যায়, সেই প্রকার মানবকে উৎসাহ, কল্পনা ও আশায় উত্তেজিত না করিলে মানব অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। আমরা জানি, উৎসাহে উৎসাহ বৃদ্ধি হয়, আন্দোলনে নিদ্রিত মানব জাগরিত হয়;—ভারতবর্ষের ভাবী আশা ভরসা এই প্রকার আন্দোলনের মধ্যে লুক্কায়িত দেখিয়া যাঁহারা নৈরাশ হইয়া বিষণ্ণ রহিয়াছেন, তাহাদিগকে আমরা আহ্লাদ সহকারে জানাইতে ইচ্ছা করি, এই অল্প সময়ের কল্পনার স্রোতে, বক্তৃতার উৎসাহে ও আন্দোলনে ভারতবর্ষে কত শুভ ফল উৎপন্ন করিয়াছে। * * * * ভারতবর্ষের কল্পনা, ভারতবর্ষের আন্দোলনে আরো কত কি নিহিত রহিয়াছে, তাহা ইতিহাসের ভবিষ্য পৃষ্ঠা উদ্ঘাটন করিয়া কে বলিতে সক্ষম?

আন্দোলনের ফল কার্য্য, ভারতবর্ষে এই আন্দোলনের স্রোত যত বর্দ্ধিত হইবে, ততই আমাদিগের আশা বৃদ্ধি হইবে। এই আন্দোলন কি করিলে বৃদ্ধি হয়, তাহা আমরা আজ বলিব না, তবে এই মাত্র জানি যন্ত্র সম্বন্ধীয় আইন প্রচারে ভারত ইতিহাসে এক অভূত পূর্ব্ব ঘটনা চিত্রিত করিবে, তবে এই মাত্র বিশ্বাস করি বিদেশীয়দিগের অত্যাচার যত বৃদ্ধি হইবে, ভারতের

গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে আন্দোলন ততই অনুপ্রবিষ্ট হইবে। সে অনুপ্রবেশের ফল কি হইবে, তাহা ইটালী ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।

কে পরাধীন, অথবা পরমুখাপেক্ষী?

প্রকৃত শিক্ষার্থীদিগের মধ্যে প্রধানতঃ দুই শ্রেণী পরিদৃষ্ট হয়। এক শ্রেণীর লোক স্বতঃই অন্যের উপর নির্ভর করিয়া শিক্ষা লাভ করে, অন্য শ্রেণীর লোক আপন চেষ্টা বা উদ্যমের উপর নির্ভর করিয়াই শিক্ষিত হয়। যাহারা অন্যের উপর নির্ভর করিয়া অল্পে অল্পে শিক্ষার রাজ্যে প্রবেশ করিতে থাকে, বাহ্যিক আড়ম্বর প্রভৃতির সহায়েই হউক, কিম্বা অন্য কোন কারণেই হউক, তাহারা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে অধিক বিষয় কণ্ঠস্থ করিতে সক্ষম হয়। আর যাঁহারা আপনাদিগের উপর নির্ভর করিয়াই শিক্ষিত হইতে প্রয়াসী হন, তাঁহাদিগের গতি বা উন্নতি উভয়ই স্থির, সহসা কেহই তাহার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হয় না, কিন্তু যদি প্রকৃত শিক্ষার কোন মহত্ত্ব থাকে, তাহা অল্পে অল্পে, অলক্ষিত ভাবে, তাঁহাদিগের আত্মাকেই এক অলৌকিক শোভায় ভূষিত করে, তাহার তুলনায় পৃথিবীর সকল শিক্ষা জ্যোতিঃবিহীন বলিয়া বোধ হয়।

প্রকৃত পক্ষে ইহার কারণ কি? এই পৃথিবীর মধ্যে যাঁহারা পর ধন ভিক্ষা বৃত্তি দ্বারা সঞ্চয় করিয়া আপন ভাণ্ডারকে অল্পকালের মধ্যে পরিপূর্ণ করিতে সক্ষম হয়, তাহাদিগের মানসিক সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম কর। আর যাঁহারা আজীবন আপন আপন শরীরের রক্ত জল করিয়া, আপন চেষ্টায় ও উদ্যমে কিঞ্চিৎ অর্থও সংগ্রহ করিতে পারেন, তাঁহাদিগের মনের সৌন্দর্য্যও দেখিয়া লও। উভয়ের সহিত তুলনা করিয়া, হে ঐশ্বর্য্যের উপাসক, বল ত কাহার মানসিক সৌন্দর্য্য স্থায়ী, অচঞ্চল, দৃঢ় এবং সুখপ্রদ? যাঁহারা তুলনায় অপক্ষপাতী, তাঁহারা কখনও কৃত্রিম শোভা সৌন্দর্য্যের সহিত প্রথম শ্রেণীর তুলনা করিতে ইচ্ছান্বিত হইবেন না;—এবং তাঁহারা বলিবেন, প্রথম শ্রেণীর ঐশ্বর্য্য ঐশ্বর্য্যের মধ্যেই পরিগণিত নহে, উহা অপকৃষ্ট শক্তির অপব্যবহারের ফল মাত্র।

আবার আর এক দিকে,—যাহারা অন্যের মস্তকে কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া স্বীয়

শরীরের কান্তি বৃদ্ধি করে, তাহাদিগের মনের শান্তি এবং বাহ্যিক চেহারার সহিত, যাহারা আপন অর্থে জীবন ধারণ করেন, তাঁহাদিগের তুলনা কর ; বলত, হে সৌন্দর্য্যের উপাসক, কাহার শরীর জ্যোতিঃ যুক্ত ?

শিক্ষা বিভাগেও এইরূপ, এখানেও স্বানুবর্ত্তিতার এক অলৌকিক সৌন্দর্য্য দেদীপ্যমান থাকে। স্বানুবর্ত্তিতার বিপদ অনেক, তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার যো নাই ; এ পথ অত্যন্ত দুর্গম, অত্যন্ত ভীষণ ; দুর্ব্বল মন লইয়া কেহই এত নৈরাশ্যের মধ্যে বাস করিতে সক্ষম হয় না। কিন্তু সৌভাগ্য-বশতঃ যাঁহারা অবিচলিত ভাবে আপন ক্ষমতার উপর আপনি তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারেন ; তাহারাই ধন্য, এবং তাঁহারাই স্বাধীন। শিক্ষার পথে বিচরণ করিবার মানসে যাঁহারা অন্যের সাহায্য অবলম্বন করেন, কিম্বা অনি-মেষ নয়নে অন্যের সাহায্য প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকেন ; তাঁহারা চিরকাল পরাধীন, চিরকাল পরমুখাপেক্ষী ; ইচ্ছা করিলেও আর তাঁহারা পরের সাহা-য্যের কথা ভুলিয়া যাইতে পারেন না। একথা কেন বলিতেছি ? শিক্ষার জন্য যাঁহারা অন্যের সঞ্চিত ধন ভিক্ষা করিতে গমন করেন, তাঁহাদের আপন অস্তিত্ব যে পরের অস্তিত্বের সহিত এক হইয়া যায়, একথা কেন বলিতেছি ? মানবের মন দুর্ব্বল ; ইহা চিরকাল তীক্ষ্ণ প্রতিভার নিকট বশ্যতা স্বীকার করে। এই দুর্ব্বল মন লইয়া যখন মানব তীক্ষ্ণ প্রতিভার নিকট গমন করে, তখন আপন অস্তিত্ব ডুবিয়া যায় ;—তখন আপনাকে বিস্মৃত হইয়া কেবল অনুকরণ করিতে ইচ্ছান্বিত হয় ; এই জন্য আমরা পৃথিবীতে দেখিতে পাই.—অনুবর্ত্তী জীবন ; এই জন্য আমরা দেখিতে পাই,—পরমুখাপেক্ষী জীবন।

আমাদিগের দেশের এবং অন্যান্য দেশের কত সহস্র লোক যে এই প্রকারে আপনার অস্তিত্ব অন্যের সহিত মিলাইয়া দিতেছে, তাহার গণনা কে করিতে পারে ? মিল, কমত,—হামিলটন প্রভৃতির প্রতিভা দেশের সকল অধিকার করিয়া ফেলিল, দেশের স্বাধীনতার অস্তিত্ব বিলোপ করিল। মিল পড়িতে যাইয়া যে লোক আপনার মত বিসর্জ্জন দিয়া মিলের অনুবর্ত্তী হয়, ইহা কেন ? কেবল মনের দুর্ব্বলতার জন্য,—কেবল দুর্ব্বল মন লইয়া অন্যের ধন ভিক্ষা করিতে গমন করে বলিয়া। এই প্রকার শিক্ষার্থী হইয়া যাহারা আপনার মত বিসর্জ্জন দেয়, তাহাদিগকে আমরা ঘৃণা করি বা না করি সে

এক কথা, কিন্তু ইহাদিগকে চিরকাল পরাধীন বা পরমুখাপেক্ষী বলিয়া স্বীকার করি।

শিক্ষাই মানবের জীবন, এবং শিক্ষাই মানবের স্বাধীনতার অবলম্বন। যাহারা শিক্ষিত নহে, তাহারা চিরকাল অন্যের মুখ চাহিয়া চলিতে বাধ্য হয়। এই শিক্ষা লাভের জন্য যাঁহারা অন্যের উপর নির্ভর করে,—শরীরের পুষ্টিসাধন কিম্বা মনের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন, ইহার কোন প্রকার কার্য্যে অন্যের উপর নির্ভর করে, তাঁহারা শিক্ষার জীবন বিস্মৃত হইয়া যায়। যেখানে শিক্ষা, সেখানেই স্বাধীনতা,—সেখানেই স্বানুবর্ত্তিতা। যেখানে শিক্ষা নাই, সেই স্থানেই পরাধীনতা,—এবং অনুবর্ত্তিতা; অনুবর্ত্তী জীব তাহারা, যাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষিত নহে। আমাদিগের দেশের লোক যে মিল এবং কমতের এত অনুবর্ত্তী, ইহার প্রকৃত কারণ এই যে আমাদের দেশীয় লোক প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষিত নহে। শিক্ষার্থী হইয়া যাঁহারা আপনার অস্তিত্ব বিসর্জ্জন দেন, তাঁহারা কখনও প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষিত হইতে পারেন না, ইহা আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস; কারণ শিক্ষাই স্বাধীনতা। যেখানে শিক্ষা আছে, অথচ স্বাধীনতা নাই, সেস্থানের শিক্ষাকে আমরা শিক্ষা বলি না; তাহা পরসঞ্চিত ধন ভিক্ষা করার ন্যায় অস্থায়ী সম্পত্তি বিশেষ। আবার যেখানে স্বাধীনতা আছে, অথচ শিক্ষা নাই, সেস্থানের স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতা বিশেষ।

আমরা পূর্ব্বাবধি বলিয়া আসিতেছি—শিক্ষাই মানব, এবং শিক্ষাই মনুষ্যত্ব। শিক্ষার জন্য যাঁহারা অন্যের উপর নির্ভর করেন, তাঁহারাই আপনার স্বাধীনতা বিনষ্ট করেন, এবং তাঁহারা কখনও প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষিত হইতে পারেন না। পৃথিবীতে যে শ্রেণীর শিক্ষার্থী অন্যের উপর নির্ভর করেন, তাঁহারা চিরকাল পরাধীন থাকেন, কিন্তু কখনও শিক্ষিত হন না; কারণ ব্যক্তিবিশেষের উজ্জ্বল প্রতিভা তাঁহাদিগের প্রতিভা মলিন করিয়া ফেলে; শিক্ষার বিশ্ববিস্তৃত অনন্ত রাজ্য তাঁহারা আর দেখিতে বা অনুমান করিতে সক্ষম হন না; তাঁহারা এক জনের প্রতিভা লইয়াই জীবন কর্ত্তন করেন। এই প্রকার লোক পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াও পরাধীন;—এই প্রকার লোক প্রকৃত প্রস্তাবে পরমুখাপেক্ষী। কিন্তু যে সকল মানব আপনার শিক্ষাকে উন্নত করিবার জন্য, আপনার অস্তিত্ব বিসর্জ্জন দেয় না; যাহারা অন্যের পুস্তকে প্রস্তারিত সত্য তখনই আপন সত্য বলিয়া গ্রহণ

করে, যখন তাহাদের আপনার বিবেচনা শক্তির সহিত মিলিত হয়, তাহারাই স্বাধীন; এবং তাহারাই স্বানুবর্ত্তী। অন্যের প্রচারিত সত্য যখন আমার বিবেচনার (Reason) সহিত ঐক্য হয়, তখনই তাহা নিজের সত্য, তখন সে সত্যের জন্য অন্যের নিকট আত্ম বিসর্জ্জন করিবার আবশ্যকতা কি? আর যতক্ষণ আপন বিবেচনার সহিত ঐক্য না হয়, ততক্ষণই বা আমার কি? মিল বা কমত উজ্জ্বল প্রতিভার অধিকারী, তাহাতে আমার কি? তাহাদের সত্য যখন আমার বিবেচনা শক্তির সহিত ঐক্য হয় না, তখন তাহা কখনও আমার মঙ্গলের বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি যিনি, তিনি কখনও আমার জীবনের ভার অন্য জীবনের প্রতি নির্ভর করেন নাই। আমার বিবেচনা শক্তিই আমার পথপ্রদর্শক, আমার নেতা; অন্যের সত্য আমার নিকট অসত্য, যতক্ষণ তাহা না আমার বিবেচনা শক্তির সহিত ঐক্য হয়। এই প্রকারে যাঁহারা আপনার উপর আপনি নির্ভর করিয়া শিক্ষার-রাজ্যে অগ্রসর হন, তাঁহারা কখনও পরাধীনতার ধার ধারেন না; এবং তাঁহারাই প্রকৃত স্বাধীন। শিক্ষার জন্য,—আপন জীবন লাভের জন্য, তাঁহারা একদিকে যেমন বাহ্য জগতের নানা প্রকার শোভা সৌন্দর্য্য, জড়জগতের অণুপরমাণুকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করেন, সেই প্রকার তাঁহারা পৃথিবীর প্রচারিত পুস্তক রাশিকে তন্ন তন্ন করিয়া মানবের মানসিক শক্তির শোভা, সৌন্দর্য্য, বল, বীর্য্য পরীক্ষা করেন। প্রকৃতির শোভা সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিবার সময় যেমন তাঁহারা আত্ম বিক্রয় করেন না, সেই প্রকার পুস্তক অধ্যয়ন করিবার সময়েও তাঁহারা আপনার মতকে বিসর্জ্জন দিয়া অন্যের অনুবর্ত্তী হন না। তাঁহারা জানেন, বিবেচনা শক্তিই মানবের মঙ্গলময় পথপ্রদর্শক;—তাঁহারা জানেন মানবের কেবল ঈশ্বরই লক্ষ্য। আর কোন প্রকার পথপ্রদর্শক নাই,—আর কেহ লক্ষ্য নাই। সংসারের শক্তি বা প্রতিভা কখনও তাঁহাদিগের স্বাধীনতা অপহরণ করিতে সমর্থ হয় না। তাঁহাদিগের উপার্জ্জিত সকল সত্য তাহারা আপনাদিগের সত্য বলিয়া স্বীকার করেন; এবং সকল সত্যকে ঈশ্বরের সত্য বলিতেও কুণ্ঠিত বা সঙ্কুচিত হন না। পৃথিবীর রাজা বা শক্তি তাঁহাদিগের মস্তককে বিলুণ্ঠিত করিতে পারে, পাশব বল তাঁহাদিগের শরীরকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে; কিন্তু মনের স্বাধীনতা কখনও অপহরণ করিতে

পারে না। এই প্রকার স্বাধীন জীবের অস্তিত্বে যে দেশ ধনী, এবং গৌরবা-
ন্বিত, সেই দেশই প্রকৃত স্বাধীন, সেই দেশই প্রকৃত পক্ষে ধন্য। আর
স্বাধীন যাহা, তাহা পরাধীন; আর ধন্য যাহা, তাহা অধন্য।

ভারতসভার পরিণাম।

ভারত-সভা যে প্রকার উদ্যম এবং উৎসাহ সহকারে রাজনীতির পথে বিচ-
রণ করিতেছেন, তাহা অত্যন্ত আশাপ্রদ। ভারতসভা এ পর্য্যন্ত যে সকল
কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া সর্ব্ব সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন,
সে সকল কার্য্যই রাজনীতি সম্বন্ধীয়। রাজ অত্যাচারে দুর্ব্বল ভারতবাসী
কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সকল আশা ভরসা পরিত্যাগ করিয়া ভাগ্যের উপাসনা
করিতে আরম্ভ করিয়াছিল; কাহারও মনে ক্ষণকালের জন্যও সুখ ও শান্তি
ছিল না। পথে যাতায়াত করিবার সময়ে রাজবংশীয় নাবিকদিগের ভীষণ
মূর্ত্তি, বিচারালয়ে পক্ষপাতী বিচারকের তীব্র দৃষ্টি এবং কর আদায়ের ভার
প্রাপ্ত অধিনায়কদিগের দয়া শূন্য উগ্র আকৃতি দেখিয়া দুর্ব্বল চিত্ত মলিন
ভারতবাসী একেবারে ভীত কলেবরে বিষণ্ণ হইয়া যাইতেছিল; এই সময়ে
ভারত সভা এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হইল। আমরা ভারতসভার জন্মদিনকে ভারত-
বর্ষের ইতিহাসের একটী উজ্জ্বল ঘটনা বলিয়া গণনা করিলাম। সে দিনের
ঘটনা আমরা কখনও বিস্মৃত হইব না। তখন আমাদের হাতে কোন পত্রি-
কার ভার ছিল, সেই সময়ে ভারত সভার জন্মের কথা কত আহ্লাদের সহিত
দিক দিগন্তরে ঘোষণা করিলাম। দিন যাইতে লাগিল, আর ক্রমেই সেই আশার
মূল ভারতসভা ক্রমে ক্রমে শত গুণে বিস্তৃত করিতে লাগিলেন। কি সুখের
চিত্র! সিবিল সর্ব্বিস প্রশ্ন এবং যন্ত্র সম্বন্ধীয় বিষয়ের আন্দোলন করিয়া ভারত-
সভা বিখ্যাত হইলেন, চতুর্দ্দিকে তাহার নাম জয়জয়কারে ধ্বনিত হইল।
ভারতসভা প্রশংসায় মুগ্ধ না হইয়া ক্রমে ক্রমে আপন কার্য্য বিভাগ আরো
বর্দ্ধিত করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রশংসায় যে আপন আসন ঠিক রাখিতে
পারে, তাহার পতন এ সংসারে কোথায়? ভারতসভা অনেক পরীক্ষা অতিক্রম
করিয়াছেন। কোন কার্য্যে বিশেষ রূপ কৃতকার্য্য না হইয়া থাকিলেও ভারত-

বাসীর মনে রাজনীতির আন্দোলন তুলিয়া এক তুমুল কাণ্ড সমাধা করিয়াছেন, এই সকল বিষয় স্মরণ করিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। এখন ভাবিতেছি ভারতসভা কেবল গবর্ণমেণ্টের কার্য্য সমালোচনার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ কথা আজ আমরা কেন বলিতেছি? ভারতসভার দোষের কথা মনে হইলে আমাদের অন্তরে আঘাত লাগে, লেখনী স্তম্ভিত হয়। বিলাতে ভারতসভার প্রতিনিধি ভারত সম্বন্ধে যে আন্দোলন তুলিয়াছেন, তাহা কি আমরা আশার চক্ষে দেখিতেছি না? ১৫ই শ্রাবণ ১২৮৬, নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য যে সভা হইয়া গিয়াছে, তাহা কি আমরা কৃতজ্ঞ নয়নে দেখি নাই? আমাদের প্রাণ কাঁদে সর্ব্বসাধারণ নিম্নশ্রেণীর লোকের জন্য; আমরা জানি এদেশের যদি কিছু হয়, তাহা নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের দ্বারায় হইবে; সেই নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের প্রতি যখন ভারতসভার চক্ষু পড়িয়াছে, তখন আর আমাদের দুঃখিত হইবার কারণ কি? যখন ভারতসভাকে আমরা প্রথম দিবস আলিঙ্গন করিয়াছিলাম, তখন মনে করিয়াছিলাম, ভারতসভা এদেশীয়দিগের সকল অভাব মোচনের জন্য চেষ্টা করিবেন; কিন্তু কি দেখিলাম! এই অল্প সময়ের বহুদর্শিতায় যাহা দেখিলাম, তাহাতে হৃদয়ে আঘাত পাইয়াছি। ভারতসভা বম্বে মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষের সময় নীরবে ছিলেন, সে কথা আমরা ভুলি নাই। পূর্ব্ববঙ্গের জলপ্লাবনের পর লক্ষ লক্ষ লোক যখন অস্বাভাবিক রোগে এবং অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তখন ভারতসভা অবিচলিত ভাবে ছিলেন, সে কথা আমাদের অন্তরে শেলবৎ বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। আবার বর্ত্তমান সময়ে যে পূর্ব্ববঙ্গের এত দুর্দ্দশা দেখিয়াও নীরব রহিয়াছেন, এ কথা আমরা কখনও ভুলিব না। ভারতসভা যখন প্রতিষ্ঠিত হন, তখন বলিয়াছিলেন, এ দেশীয়দিগের সকল প্রকার দুর্দ্দশা দূর করিতে চেষ্টা করা হইবে। সে প্রতিজ্ঞা বোধ হয় এ যাত্রায় কল্পনায়ই রহিয়া গেল। ভারতসভার অধিনায়কগণ যতদিন এদেশের নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের অন্ন সংস্থানের জন্য বিশেষ চেষ্টা না করিবেন, যতদিন দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকদিগের জীবন রক্ষার্থ সদুপায় আবিষ্কার না করিবেন, ততদিন কখনও নিম্নশ্রেণীর ভালবাসা পাইবেন না। নিম্নশ্রেণীর ভালবাসা না পাইলে, ইহার ভবিষ্য জীবনীতে কি আছে, আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিএসনের যে দশা

হইয়াছে, তাহা হইলে ইহারও সেই দশা উপস্থিত হইবে। কিন্তু আমাদের এই ক্রন্দনধ্বনি কে শুনিবে? ভারতের দুর্ভিক্ষ পীড়িতদিগের জন্য যে আমরা ব্যথিত হৃদয়ে এত চিৎকার করিতেছি, ইহা কাহার হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইবে? অনেকে বলিবেন, ভারত সভা ত সাধারণের বিদ্যাশিক্ষার জন্য নিয়ম করিয়াছেন; আমরা বলি এদেশের লোকদিগের প্রাণ বাঁচিলে ত বিদ্যা শিক্ষা;—আপন সত্বজ্ঞান; কিন্তু আমরা বলি দুর্ভিক্ষের ভীষণ আক্রমণ ভারতকে পরিত্যাগ করিলে ত লোকের সাময়িক উন্নতি হইবে। ভারতসভা যদি রাজনীতির মূলসূত্র অবলম্বন করিয়া স্বভাবের সাম্য রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন;—ভারত সভা যদি এদেশের লোকদিগের অসাময়িক পতনের মধ্যে ভাবী আশার বীজ সংস্থাপন করিয়া থাকেন, তবে আমরা নীরবে থাকি, এবং সকল সহানুভূতির বন্ধন ছিন্ন করি। দেশের লোক মরিয়া যাক্, আমরা স্বভাবের সাম্য রক্ষা করি এবং ভাবী আশার স্বপ্নে নৃত্য করি; ইহাই যদি ভারত সভার উদ্দেশ্য হয়, তবে আমরা আমাদের স্বর নীরব করিয়া, সেই শত সহস্র কৃষক এবং অন্যান্য শ্রমজীবীদিগের সহিত মিলিত হইয়া যাই; ভারত সভা আমাদিগের অস্থির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া জাতীয় জীবন উত্থাপনের চেষ্টায় রত থাকুন। অহো দুর্ভাগ্য কি বিড়ম্বনা !!

ভারত-সভা ও বিলাতে স্থায়ী প্রতিনিধি।

যিনি যাহাই বলুন, আমরা একটী সার জ্ঞান লাভ করিয়াছি;—সেটী এই যে—পতিত দেশকে উদ্ধার করিবার জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, তাহার মধ্যে বিদেশীয় রাজার অত্যাচার সর্ব্ব প্রধান। ইতিহাস এই কথার ভূয়ঃ ভূয়ঃ সাক্ষ্য প্রদান করিতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই অত্যাচার ভিন্ন অশিক্ষিত লোকের কখনও নিদ্রা ভঙ্গ হয় না;—কিম্বা তাহাদিগের মন উৎসাহিত হয় না। শিক্ষিত সম্প্রদায় অত্যাচার ব্যতীতও যে আপন আসন প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন স্বীকার করিয়া থাকে, সে কথা অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু ভাবিয়া দেখ ত সে প্রকার শিক্ষিত লোকের

সংখ্যা কত অল্প? কেবল এই বাঙ্গলা প্রদেশে ৭ কোটী লোকের বাস; ইহার মধ্যে ৬। ৭ লক্ষ লোক শিক্ষিত কি না সন্দেহ। তবেই দেখা গেল, প্রতি সহস্রে এক জন লোক শিক্ষিত কি না, সে বিষয়েও সন্দেহ রহিয়াছে। এখন যাহারা দেশের অভাব বুঝিয়াছে, তাহারা এই শিক্ষিত শ্রেণী; এই শিক্ষিত শ্রেণী ভিন্ন অন্য কেহ কি দেশের কোন প্রকার হিতকর কার্য্যে যোগ দান করিয়া থাকে? আমাদিগের দেশের লোকের কোন কথায় যে গবর্ণমেণ্ট কর্ণপাত করেন না, তাহার কারণ এই,—সমস্বর কিম্বা সমবেত বল এইক্ষণ ও এদেশে স্বজিত হয় নাই। গবর্ণমেণ্টের কোন কথার প্রতিবাদ করিলে, গবর্ণমেণ্ট মনে করেন, এ প্রতিবাদ কেবল এক শ্রেণীর,—এদেশের সকলের স্বর এ নহে। ভারত-সভার প্রতিনিধি সম্বন্ধেও যে এই প্রকার কত কথা আরোপিত হইয়াছে, তাহা কোন্ শিক্ষিত লোক না পাঠ করিয়াছেন? ভারত-সভা যে জাতীয় সভা নহে, নানা কারণে তাহা আমরাও স্বীকার করি; যদি ইহা জাতীয়-সভা হইত, তবে ইহার ভয়ে গবর্ণমেণ্ট জড়সড় হইতেন;—ইহার ভয়ে সশঙ্কিত হইতেন; তাহা হইলে বিলাতে প্রতিনিধি পাঠাইবার ও কোন প্রয়োজন থাকিত না; এই স্থানে বসিয়াই সকল কথার প্রতিবাদ করা যাইত এবং প্রতিবাদে সুফল ফলিত। ভারত-সভা বলিলে, যদি ইংরাজেরা বুঝিত এ সমগ্র ভারতের প্রতিনিধি:—তবে কি ইহাকে সম্মান না করিয়া পারিত? কোন্ রাজা কবে জাতীয় সমস্বরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারিয়াছে? ইতিহাস কি এই কথার প্রতিবাদ করে না? আমরা ত যাহা জানি তাহা এই যে,—যখন রাজা বুঝিতে পারে যে এই কথাটী প্রত্যেক প্রজার হৃদয়ের ধ্বনি;—তখন তাহা অমান্য করিতে কখনও সক্ষম হয় না। ঘোরতর অত্যাচারী বা স্বেচ্ছাচারীর পরাক্রমও এ স্থানে পরাস্ত হইয়া যায়। আমরাও ভারত-সভাকে এক শ্রেণীর মুখপাত্র বলিয়া জানি। তবে যে ইহাকে এত আদর করি,—সে এই জন্য, যে ভবিষ্যতে ইহাই জাতীয় সভারূপে পরিণত হইতে পারে। কিন্তু সভা এইক্ষণ হইতেই সে পথে যখন কণ্টক রোপণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন আমরা চুপ করিয়া থাকিতে পারি না।

ভারত সভার একান্ত পক্ষপাতী যাঁহারা, তাঁহারাও বলিবেন ভারত-সভা এখনও জাতীয় সভা রূপে পরিচিত হইতে পারে নাই, ইহা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সভা। যত দিন নিম্ন শ্রেণী,—কোটী কোটী মূক নিম্নশ্রেণী ইচ্ছা পূর্ব্বক ইহাতে

প্রতিনিধি প্রেরণ না করিবে, তাবৎ ইহা এই প্রকারেই থাকিবে। যে কয়েকটী কারণে ইহা জাতীয় সভা হইতে পারিবে না; তাহাই নিম্নে প্রদর্শিত হইল;—

১। লোক অভাব না বুঝিলে কখনও সেই অভাব দূর করিবার জন্য চেষ্টা করে না। আমাদিগের দেশের অধিকাংশ লোকই গবর্ণমেণ্টের পক্ষপাতী;—তাহারা গবর্ণমেণ্টের দোষ দেখিতে পায় না,—তাহারা অন্ধ। যত দিন তাহারা গবর্ণমেণ্টের দোষ দেখিতে না পাইবে, তত দিন তাহারা কখনও সেই দোষের বিরুদ্ধে স্বর তুলিবে না। কিন্তু এইক্ষণ যে সকল দোষ আমরা দেখিতে পাইয়া তাহার বিরুদ্ধে চিৎকার করিতেছি,—এই সকল অন্যায় অত্যাচারের কথাই তাহাদিগকে জাগরিত করিবার সহায়। এই সকল অন্যায় অত্যাচারের কথা তাহাদিগের কর্ণে কর্ণে ঘোষণা করিলেই তাহারা গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইবে। আর যদি গবর্ণমেণ্টের সে স্বেচ্ছাচারিতার দোষ সকল দূর হইয়া যায়, তবে কেন লোক একত্রিত হইয়া তাহার প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইবে? কেনই বা লোক একতা বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া বদ্ধ পরিকর হইবে? আর কেনই বা তাহারা সভায় যোগ দিবে? ভারত-সভা যদি গবর্ণমেণ্টের অবৈধ ব্যবহার গুলি সংশোধন করিতে সক্ষম হন, (যখন চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন তাহাই আশা করা যায়) তবে নিশ্চয় দেশের লোকদিগকে জাগাইতে পারিবেন না। ভারত-সভা এইক্ষণ আপন কর্ত্তব্যকে কোন্ দিকে পরিচালিত করিয়াছেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না; কিন্তু আমরা ত জানিতাম যে, জাতীয় অভ্যুদয় ইহার প্রধান লক্ষ্য। সকলে স্মরণ রাখিবেন, সভা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অবৈধ ব্যবহারের প্রতিবাদ করিতে যাইয়া ক্রমে ক্রমে সঙ্কীর্ণ স্থান অবলম্বন করিতেছেন। কারণ এ দেশের নিম্নশ্রেণী,—অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীকে জাগরিত করিতে হইল,—অন্যায় অবৈধ অত্যাচারই এক মাত্র সহায়। সে গুলির সংশোধনের চেষ্টা করিতে যাইয়া সভা দেশের ভবিষ্যতের মহা অনিষ্টসাধন করিতেছেন।

২। অভাব জ্ঞাপন ভিন্ন ও লোককে জাগরিত করা যায়,—সে ভালবাসার দ্বারায়। এক জন লোককে এক জনের বিরোধী করিতে হইলে হয় এই চাই— যে সে লোকের নিকট অন্যের দোষ কীর্ত্তন করিতে হইবে; না হয় তাহাকে ভালবাসার দ্বারায় বস করিতে হইবে। এ দেশের নিম্ন-শ্রেণীর লোকদিগকে

জাগরিত করিতে হইলে এই দুইটী উপায় অবলম্বন করিতে হইবে,—একটী উপায় রাজার অত্যাচার প্রচার;—দ্বিতীয় উপায় তাহাদিগকে ভালবাসায় আবদ্ধ করিয়া, তাহাদিগের প্রকৃত উন্নতির পথ প্রদর্শন। কতকগুলি লোক ভাল হয়—অন্যের অত্যাচার হইতে মুক্ত হইবার জন্য; আর কতকগুলি লোক ভাল হয়—কেবল উন্নতির আকর্ষণে। অশিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে উন্নতির আকর্ষণে আকৃষ্ট হইবার লোক অতি অল্প। যাহা হউক সে পথে ও ভারত-সভা কণ্টক পুতিয়াছেন। নিম্নশ্রেণীর ভালবাসা পাইতে হইলে, তাহাদিগকে এই বুঝিতে দেওয়া উচিত যে, তাহাদিগের জন্য বাস্তবিক প্রাণ কান্দে, হৃদয় ব্যাকুল হয়;—তাহাদিগের দুঃখে সমদুঃখী না হইলে কখনও তাহা সংসিদ্ধ হইতে পারে না। ভারত সভা কি নিম্নশ্রেণীর দুঃখে কাতর? ভারতসভা কি নিম্নশ্রেণীর ভালবাসা পাইবার পথ রাখিয়াছেন? ভারতসভা কি দরিদ্রদিগের আর্ত্তনাদে ব্যথিত হইয়াছেন? ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় লক্ষ লক্ষ লোক এই কয়েক বৎসর হাহাকার ধ্বনি করিতেছে;—ভারতসভা একবারও কি সেই দিকে কর্ণ দিয়াছেন? বম্বে, মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষের সময় নিম্নশ্রেণীর হৃদয় বিদারক বিলাপ ধ্বনিতে পাষাণ পর্য্যন্ত বিগলিত হইয়া আপন বক্ষ বিদারণ করিয়া জল দিয়াছে; কিন্তু তবুও ভারত সভার কর্ণে সে ধ্বনি আঘাত করে নাই! ম্যালেরিয়া রোগে পশ্চিম বাঙ্গলা একেবারে জন প্রাণী শূন্য হইয়া গিয়াছে,—সে চিত্র দেখিলে কোন পাষাণ হিতৈষীর মন না ব্যাকুলিত হয়,—তাহাদিগের দুঃখে দুঃখিত হয়? কিন্তু ভারত সভার মনে সে দুঃখের চিত্র একবার ও প্রতিবিম্বিত হইয়া ইহাকে চিন্তিত বা বিষণ্ণ করিতে পারে নাই! পূর্ব্ব বঙ্গের অস্বাভাবিক জল প্লাবনের পর কত লোক অস্বাভাবিক রোগে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে; সে কথা সভা একবার ও আপন স্মৃতিতে অঙ্কিত করেন নাই! আবার এবার পূর্ব্ব বাঙ্গলার পল্লিতে পল্লিতে কত লোক হাহাকার করিতেছে—কত অশ্রুপাত, দিন রাত্রি, অজানিত রূপে, মৃত্তিকায় শুষ্ক হইয়া যাইতেছে;—ভারত সভা কি ইহার তত্ত্ব ও সংগ্রহ করিতে পারিতেন না? অর্থ নাই তাহা যেন স্বীকার করিলাম; কিন্তু গ্রামে গ্রামে যাইয়া সেই সহস্র সহস্র দরিদ্রদিগের কষ্টের কথা সংবাদ পত্রে লিখিয়াও ত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারিতেন!! মোট কথা সে প্রকার ইচ্ছা নাই। মোট কথা সে

প্রকার জীবন নাই। মোট কথা সে প্রকার ভালবাসা নাই। ভালবাসা ভিন্ন কে কবে অন্যকে আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছে? ভালবাসা ভিন্ন কে কবে অন্যের দুঃখে ব্যথিত হইয়াছে? সভায় বক্তৃতা—ইংরাজিতে বক্তৃতা করিলেও ভালবাসা দেখান হয় না—তাহাতে ক্ষণস্থায়ী যশ ও মানই সঞ্চয় হয়। সংবাদ পত্রে আপনার প্রশংসা করিলেই নিম্ন-শ্রেণীর মন পাওয়া যায় না; তাহাতে কেবল নামই বিখ্যাত হয়। ভারত সভার হৃদয়ে ভালবাসা নাই,—অন্তরে সহানুভূতি নাই—নিম্নশ্রেণীর জন্য প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার প্রাণ কান্দে না। অনেকে বলিবেন "কেন? নিম্ন-শ্রেণীর শিক্ষার জন্য ত সভা চেষ্টা করিতেছেন।" যাঁহারা আজীবন সহরে বাস করিতেছেন, তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে কখনও দেশের দুরবস্থা কল্পনা করিতেও পারেন না। পশ্চিম বাঙ্গলায় যাইয়া দেখ ত, হিতৈষি,—তোমার মন অগ্রে কি চায়? লোক শিক্ষা করিবে কি প্রকারে?—রোগে শীর্ণ, অনাহারে জীর্ণ, মনে স্ফূর্ত্তি নাই, হৃদয়ে উৎসাহ নাই। যাও ত পূর্ব্ব বাঙ্গলায়? সেখানে যাইয়া বল, নিম্ন-শ্রেণি,—দুর্ভিক্ষে তোমরা মরিতে বসিয়াছ,—একটু অপেক্ষা কর—আমরা তোমাদের মধ্যে একটু শিক্ষা দেই! শিক্ষা যদি ম্যালেরিয়া বিনাশক হইত, শিক্ষা যদি দুর্ভিক্ষ নিবারণের অমোঘ ঔষধ হইত, তবে আমরাও ইহাই অবলম্বন করিতে বলিতাম। আমরা বলি,—লোকের প্রাণ আগে, তারপর শিক্ষা। শিক্ষায় ভবিষ্যতে মঙ্গল হয় বলিয়া, কি এইক্ষণ চুপ করিয়া থাকা উচিত? ভারত সভা চুপ করিয়া আছেন বলিয়াই, আমরা বলিতেছি যে, দিন দিন সভা নিম্ন-শ্রেণীর ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হইতে বসিয়াছেন বলিয়াই, আমরা বলি, সভা দেশের সর্ব্ব সাধারণের সহানুভূতি পাইবেন না।

৩। ভারত সভা যাহাই মনে করুন না কেন, ইংরাজি ভাষার আদর করিতে যাইয়া সভা অধিকাংশের সহানুভূতি হারাইতেছেন। ভারত সভা যদি এ দেশের সভা হয়, তবে কেন ইহার কার্য্যাদি ইংরাজি ভাষায় নির্ব্বাহ হয়? ভারতের কত জন লোক ইংরাজি জানে? হয় বল, ইহা কেবল ইংরাজি বিদ্যার অধিকারীদিগের সভা, না হয়,—উক্ত ভাষা পরিত্যাগ কর। ইংরাজি ভাষায় মন সতেজ হয়, জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, তাহা কি আমরা অস্বীকার করিতেছি? আমরা বলি জাতীয় ভাষা ভিন্ন কখনও জাতির শ্রীবৃদ্ধি হয় না। সভা

জাতীয় ভাষায় ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া ভবিষ্য উন্নতির পথে কণ্ঠক রোপণ করিতেছেন। হয় ত অনেক বলিবেন,—আজ জাতীয় ভাষায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিলে, ভারতের অধিকাংশই তাহা বুঝিবে না। তাতে কি? আজ না বুঝুক, এ উপায় অবলম্বন করিলে অনেকে ভবিষ্যতে বুঝিতে চেষ্টা করিবে। গবর্ণমেণ্ট ইংরাজি ভাষায় যখন প্রথম কার্য্য চালাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন কত জন লোক ইংরাজি বুঝিত? এইক্ষণ দেশীয়দিগের সকল কার্য্য যদি দেশীয় ভাষায় নির্ব্বাহ হয়, তবে নিশ্চয় সকলেই জাতীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে প্রবৃত্ত হইবে। ভারত-সভা কেবল যে উপকারের জন্য ইংরাজি ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা নহে; সভা জাতীয় ভাষাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন। সুপ্রসিদ্ধ ব্রাইট সাহেবকে ধন্যবাদ দিবার সময়ে টাউনহলে যে সভা হইয়াছিল, সেই সভায় ঢাকার জনসাধারণ সভার প্রতিনিধি নাকি বাঙ্গলায় বলিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু সভা তাঁহাকে অনুমতি প্রদান করিলেন না।* বহরমপুরের রাজীব লোচন বাবুকে সভার অন্যতর অধ্যক্ষ সভার কার্য্য বিবরণের ভাষাসম্বন্ধে যে প্রকার অবমাননা করিয়াছেন; তাহা আমাদের অন্তরে লাগিয়া রহিয়াছে।† ভারত সভা জাতীয় ভাষা পরিত্যাগ করিয়া দিন দিন এক শ্রেণীর মুখপাত্র হইয়া পড়িতেছেন।

আমরা উপরে যে সকল কথা বলিলাম, ইহাতেই প্রতিপন্ন হইবে, ভারত সভা জাতীয় সভা নহে; ইহাতে ভারতের সমগ্র মানবের স্বর নাই; ভবিষ্যতে যে ইহা সমগ্র ভারতের প্রতিনিধি হইবে, তাহারও সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ভারত সভায় যে কোন কার্য্য তাহা এক শ্রেণীর কার্য্য; সমগ্র ভারতের নহে। ভারতের শিক্ষিতদিগের মধ্যেও অনেকে ইহার প্রতি দিন দিন হত-শ্রদ্ধায় দৃষ্টি করিতেছেন। ইংলণ্ডে স্থায়ী প্রতিনিধি নিয়োগ সম্বন্ধে অর্থ সংগ্রহ তাহার মধ্যে একটী প্রধান কারণ। প্রতিনিধি নিয়োগ সম্বন্ধে আমাদিগের এই বক্তব্য;—

প্রথমতঃ প্রতিনিধি স্থায়ীরূপে রক্ষা করিলে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হইবে, কিন্তু উপকার হইবে না। ইহা নিশ্চয় যে একজন লোক বিলাতে বসিয়া ভারতের সকল অভাব সম্যক প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না; যদি তাহা সম্ভব

* সাধারণী ৩০ ভাদ্র।

† সাধারণী ৩০ ভাদ্র।

হইত, তবে গ্লাডোষ্টোন, ব্রাইট, ফসেট প্রভৃতিই প্রতিনিধি রহিয়াছেন, আর প্রতিনিধির প্রয়োজন কি? ইহাদিগের প্রাণ ভারতের জন্য যে প্রকার অস্থির, এরূপ আর কাহার? কিন্তু সেই দূর দেশে থাকিয়া ইঁহারা ভারতের সকল অভাব বুঝিতে পারেন না। বিলাতে যদি স্থায়ী প্রতিনিধি থাকে, তবে তাঁহাকে যে এই কষ্টে পতিত হইতে হইবে না, তাহা কে বলিতে পারেন?

প্রতিনিধি যতই সহৃদয় হউন না কেন, এদেশে থাকিলে তিনি দেশের যত অভাব বুঝিতে পারিবেন, অভাবের চিত্র পরিত্যাগ করিয়া কখনও সে প্রকার পারিবেন না, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য ঘটনা। কিছুদিন বিলাতে থাকিলে তাহাকে বিলাতের লোকেরা বলিবে—প্রতিনিধি সমগ্র ভারতের প্রতিনিধি নহে। বাবু লালমোহন ঘোষ সম্বন্ধেও এ কথা অনেকে বলিয়াছেন। আমরাও এ কথা অস্বীকার করিতে পারিব না, কারণ ভারত-সভা কেবল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সভা, ইহাতে নিম্ন-শ্রেণীর কোন মত নাই। এই প্রকার অপমান সূচক কথা শুনিতে শুনিতে নিশ্চয় প্রতিনিধির মন বিরক্ত হইবে, কার্য্যের প্রতি শৈথিল্য জন্মিবে, বিলাতের পরিবর্ত্তন স্রোত হয়ত তাহাকে কর্ত্তব্য স্থান হইতে ভ্রষ্ট করিয়াও ফেলিতে পারে। কিন্তু যখন এদেশের সকলের মত এক হইবে,—এ দেশের নিম্ন-শ্রেণী ও উচ্চ শ্রেণীর স্বর যখন এক হইয়া যাইবে, তখন প্রতিনিধি সম্বন্ধে কেহ কোন কথা বলিতে পারিবে না। অগ্রে সেই স্বর মিলাইতে চেষ্টা করা উচিত। যে দেড় লক্ষ টাকায় বিলাতে প্রতিনিধি রাখিবার কথা হইতেছে, সে টাকার আয়ে স্বদেশী ৫০ জন লোক দেশের দ্বারে দ্বারে প্রচার করিলে, ৫০ বৎসরে নিশ্চয় এদেশের নিম্ন শ্রেণীর সহানুভূতি কতক পরিমাণে এই দিকে আসিবে। এই প্রকার করিতে করিতে যখন সকলের স্বর মিলিয়া এক হইবে—অর্থাৎ সমগ্র জাতি যখন একমত হইবে, তখন একটী ধ্বনিতে গবর্ণমেণ্ট নিস্তব্ধ হইবেন;—তখন একটী প্রতিরোধের ধ্বনি শুনিলে আর গবর্ণমেণ্ট অগ্রসর হইতে পারিবেন না। বিলাতে যে জাতীয় স্বরের এত বল, তাহা কেবল এই জন্য যে, সে স্বর প্রত্যেকের হৃদয় হইতে উত্থিত হয়;—রাজ সিংহাসন সে প্রকার স্বরে কম্পিত হইয়া যায়—রাজা আর সিংহাসনে বসিতে সক্ষম হয় না। রাজা কি? সে কেবল প্রজাপুঞ্জেরই শক্তি বিশেষ। সেই প্রজাপুঞ্জ যদি রাজার বিরোধী হয়, সাধ্য কি রাজার যে সিংহাসনে বসিয়া থাকিবেন? আমাদিগের দেশেও যখন

সেই প্রকার বল সৃজিত হইবে, তখন একমুহূর্ত্তে গবর্ণমেণ্ট সংশোধিত হইয়া যাইবে। এদেশের যদি কিছু মঙ্গলকর পথ থাকে, তবে সে পথ সমবেত বল সৃজন করা,—তবে সে পথ সকলের স্বরকে এক করা। ভারতসভা আমাদিগের দেশের এই অভাব মোচন করিবেন, আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু ক্রমে ক্রমে আমাদিগের সে ভ্রম-পরিপূর্ণ আশা দূর হইতেছে। ইংরাজ জাতির অত্যাচার বৃদ্ধির সহিত এ দেশে সমবেত বল সৃজিত হইবে, সকলের স্বর এক হইবে, ইহা আমাদিগের দৃঢ়বিশ্বাস। প্রতিনিধি প্রেরণে যখন সে পথে কণ্টক পড়িতেছে, তখন অর্থ ব্যয় করিয়া কি তাহা করা উচিত? অন্য দিকে প্রতিনিধি যখন সমগ্র জাতির প্রতিনিধি নহেন (এবং আশা করি সকলেই এক মতে বলিবেন যে জাতীয় প্রতিনিধি নহে) তখন ইহার দ্বারা নিশ্চয় কোন প্রকার ফল দর্শিবে না;—ইংরাজেরা ইহার কথাকে কোন প্রকার গুরুত্ব বোধে ভয় করিবে না; তখন বৃথা অর্থের শ্রাদ্ধে যোগ দিব কেন? আর সেই অর্থ ব্যয়ে যোগ দিব কখন? না—যখন ভারত অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে—লক্ষ লক্ষ লোক যখন অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছে! জাতির অর্থ, যে প্রকারেই হউক, তাহা দেশে থাকিয়া দেশের উপকারে লাগে, ইহা আমাদিগের একান্ত বাসনা। সেই অর্থ বিনা কারণে সাগরের পারে ব্যয় করিতে কখনও অনুমোদন করিতে পারি না।

আমরা ভারত সভাকে এ পথ পরিত্যাগ করিতে অন্তরের সহিত অনুরোধ করি। সভা যে কখনও ভ্রমে পতিত হইতে পারেন না, এ বিশ্বাস কখনও করিবেন না। এই ভ্রম হইতে সভা উদ্ধার হন, ইহা আমাদিগের একান্ত বাসনা। এ পথ পরিত্যাগ করিয়া দেশে সমবেত বল সৃজন করিতে চেষ্টিত হউন। গবর্ণমেণ্টের অন্যায় অত্যাচারই এ পথের প্রথম সহায়। দ্বিতীয় সহায় ভালবাসা, এবং তৃতীয় সহায় জাতীয় ভাষা। এই সকল অবলম্বন করিয়া দেশের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হউন। যাঁহার অর্থ থাকে, সে অর্থ দিবে; যাহার ভাষা থাকে, সে ভাষা দিবে; যাহার জীবন থাকে, সে জীবন দিবে; আর যাহার স্বর থাকে, সে স্বর মিলাইবে। এই প্রকার করিলে সভা পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে এ দেশে যে বল সঞ্চারে সমর্থ হইবেন, সে বলের সীমা আয়ত্ত করিয়া গবর্ণমেণ্ট, আপনি ভয়ে ভয়ে, আপন অত্যাচারের জাল গুটাইয়া লইবেন। ইহা যদি না করেন, নিশ্চয় ভারত-সভা এক শ্রেণীর মুখপাত্র

হইবে;—এবং নিশ্চয় ইহার দ্বারা ভারতের সমগ্র উন্নতির পথে কণ্টক পড়িবে।

বাণিজ্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে, স্বীয় সাধনার বলে, যে জগৎ বিখ্যাত বৃটীশ সেনাপতি পলাশি সমরে সিংহ সদৃশ সিরাজুদ্দৌলাকে পরাস্ত করিয়া, ভারতে বৃটীশ সাম্রাজ্য স্থাপনের বীজ বপণ করিয়াছিলেন, সেই ক্লাইব প্রথমে বণিকের বেশে * এ প্রদেশে আগমন করেন। বাণিজ্য রাজনীতির প্রকাশ্য মন্ত্র,—রাজনীতির অভিন্ন সহচর। যেখানে বাণিজ্য সেইখানেই রাজনীতির কপটতা—প্রবঞ্চনা—ছলনা। রাজনীতি ব্যতীত বাণিজ্যের উন্নতি ক্ষণস্থায়ী। বাণিজ্য সাধনার উৎকৃষ্ট ফল অর্থ। কৃষিতে ধনের উৎপত্তি হয়, অর্থ এবং ধনে চির বৈষম্য। অর্থ কেবল মুদ্রা প্রভৃতিকে বুঝায়। ধন পৃথিবীর সমস্ত স্থায়ী সম্পত্তি। ধন ব্যতীত বাণিজ্য চলিতে পারে না, সুতরাং কৃষি বাণিজ্যের জীবন স্বরূপ। কৃষি এবং বাণিজ্যে এই অভিন্ন মিলন সত্তেও ইহাদের মধ্যে ঘোর বৈষম্য বিদ্যমান। প্রীতি ও রাজনীতিতে যে বৈষম্য, কৃষি ও বাণিজ্যে ঠিক সেই রূপ। বাণিজ্য রাজনীতির কপট মন্ত্রে দীক্ষিত, পরিপোষিত এবং পরিবর্দ্ধিত; এক দণ্ডও রাকনীতির কপট মন্ত্র ছাড়া হইয়া থাকিতে পারে না। রাজার সাহায্য ব্যতীত কখনই বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয় না। কিন্তু কৃষিতে যে সরলতা, তাহা রাজার অধীনেই অপকৃষ্টতা লাভ করে। সমস্ত ইউরোপের বাণিজ্য ইতিহাস প্রথমটীর সাক্ষ্য প্রদান করিবে। আধুনিক বঙ্গদেশের ভূমি এবং কৃষির দুরবস্থা দ্বিতীয়টীর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। যে ভূম্যাধিকারীর ভয়ে প্রজা সর্ব্বদাই সঙ্কুচিত হইয়া, ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতে ও তদ্দ্বারা প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপাদন করিতে নিরস্ত রহিয়াছে, সে জমিদার বা রাজাকে কৃষির মিত্র না শত্রু ভাবিব? এরূপ জমিদার বা রাজাকে আমরা শত্রু বই আর কি বলিব। কেবল তর্কের জন্য বলিতেছি, এমত নহে। পৃথিবীর অধিকাংশ রাজাই স্বীয় স্বার্থ সাধনার্থ প্রজাবর্গের সামান্য কৃষির উৎপন্নের প্রতি তীক্ষ্ণ

* ক্লাইব বণিকের কেরাণী হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন।

দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। কৃষি সরলতায় পরিপূর্ণ, তাই রাজনীতির কপটতাময় সাহায্য হইতে চিরবঞ্চিত। বাণিজ্য কলহ বিবাদপূর্ণ—রক্ত-মিশ্রিতকপট মিত্র-ভাবই ইহার একমাত্র অবলম্বন। কৃষি—শান্তিময়। সহরে প্রবেশ করিলে যে শব্দে কর্ণ বধির হয়, সে বাণিজ্যের কলহ বিবাদ; আর পল্লিগ্রামে যে চিরশান্তি বিরাজিত, তাহা কৃষি হইতে উৎপন্ন। সংক্ষেপে কৃষি ও বাণিজ্যে এই অসামান্য বৈষম্য থাকিলে ও দুইয়ের মধ্যে এমনি সংশ্লিষ্ট মিলন, যে একের অভাবে অন্য অসার ও অপদার্থ হইয়া পড়ে। সংসারের স্ত্রী পুরুষে যে সম্বন্ধ, কৃষি বাণিজ্যে ও সেই সম্বন্ধ; এ দুয়েই সংসারের উন্নতির সহায়তা করে। ইহারা ঘোরতর বৈষম্যময় হইলেও চিরকাল অভিন্ন রূপে সংসারের উন্নতির সোপান। বাণিজ্য অর্থের সংখ্যা বৃদ্ধি করে, অর্থাৎ এক দেশের বা এক স্থানের অর্থ সংগ্রহ করিয়া স্বীয় দেশের অর্থ বৃদ্ধি করা, এক প্রকার বণিকদিগের সহজ সাধ্য ব্যাপার। বাণিজ্যের চাকচিক্যে ও কপটমন্ত্রে এমনি মায়াবিনী, প্রবর্ত্তিনী শক্তি নিহিত, যে একবার বাণিজ্যের প্রতিদৃষ্টি পড়িলে, আর রক্ষা থাকে না, ইচ্ছা করিয়া ঘরের টাকা বাহির করিয়া দিতে প্রবৃত্তি জন্মে। আবশ্যক, অনাবশ্যকের বাধা বাণিজ্য মানে না। বাণিজ্য অর্থ সঞ্চয়ের বীজ মন্ত্র, ইহাতে সমগ্র পৃথিবীর অর্থ সংখ্যা বৃদ্ধি করে না; এক স্থানের অর্থকে অন্য স্থানে রাশিকৃত করে, এই মাত্র। এই উপায়ে দেশ বিশেষ যে একেবারে দরিদ্র হইয়া পড়ে, সে বিষয়ে বণিকেরা একবার ও ভাবেন না*। কিন্তু কৃষি সমগ্র পৃথিবীরই অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করে, অর্থাৎ ধন কৃষি দ্বারাই বৃদ্ধি হয়। ব্যক্তি বিশেষের কিম্বা দেশ বিশেষের অর্থ বৃদ্ধিকে ধন বৃদ্ধি বলিতে পারি না।

যদিও অর্থের সহিত মানবের চিরকাল বিচ্ছিন্ন ভাব, তত্রাচ এই অর্থ সঞ্চয়ের জন্য সকলেই লালায়িত। এই অর্থ সঞ্চয়ের পথ কাহারও অবরুদ্ধ থাকে না। মানব অন্য সময়ে স্বীয় মন্ত্র গোপন করিতে না পারিলেও, অর্থ অঞ্চয়ের সময় মন্ত্র গোগন রাখিতে বিশেষ পটু। ধর্ম্মের ভয়ানক ও কঠোর ধর্ম্মভাব এখানে পরাস্ত। জন্ম মৃত্যুর নীরব, নিস্তব্ধ সময়ে সংসারের অর্থের সহিত কাহার

* The commerce of the world was looked upon as a struggle among nations, which could draw to itself the largest share of gold and silver in existence; and in this competition no nation could gain anything, except by making others loose as much or at the least. Prof Mill's. Pol. Eco.

সম্বন্ধ ছিল? কিন্তু যাই মানুষ হইলাম, যাই মনুষ্যত্বের বীজ হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইল, অমনিই অর্থ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলাম; পৃথিবীর সৎপ্রবৃত্তি সমুদয় বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত হইলাম না। সংসারের একমাত্র রব অর্থ। এই অর্থ কি প্রকারে উপার্জ্জন করা যায়, তাহার উপায় পৃথিবীতে অনেক প্রকার, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কৃষি অর্থের উৎপাদক, সমগ্র পৃথিবীর ধনের সৃষ্টি কারক; বাণিজ্য অর্থ আকর্ষণের অব্যর্থ মহৌষধ; ক্রোড় বিশেষকে হীন জ্যোতিঃ করিয়া স্বীয় ক্রোড় উজ্জল করিবার এক অপূর্ব্ব আলো। বর্ত্তমান প্রস্তাবে অর্থ বৃদ্ধির উৎকৃষ্ট উপায় বাণিজ্যই আমাদের আলোচ্য।

বাণিজ্য একমাত্র বিনিময়ের উপর নির্ভর করে। যে বিনিময়তে বিভিন্ন দেশীয় স্বভাব-সুলভ দ্রব্যাদি সকল প্রদেশেই সম পরিমাণে বিতরিত হয়; অর্থাৎ যাহাতে কোন দেশেরই কোন অভাব থাকে না; সে বিমিনয় অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। শিল্প নির্ম্মিত অথবা স্বভাবজাত দ্রব্যাদি সকল প্রদেশে এক প্রকার নহে; কোন দেশ কোন কোন দ্রব্যের জন্য বিখ্যাত, আর অন্য কোন দেশ হয়ত অন্য কোন দ্রব্যের জন্যেই প্রসিদ্ধ; এমন স্থলে বাণিজ্য মধ্যবর্ত্তী হইলে পরস্পর উৎকৃষ্টতম এবং নিকৃষ্টতম দ্রব্যাদির বিনিময়ে, পরস্পরের অভাবই দূর হয়। এই জন্যেই বাণিজ্যে অশেষ প্রকার মঙ্গল সাধিত হয়।

অতি প্রাচীন কালে কেবল দ্রব্যাদির বিনিময়ের উপরই বাণিজ্য চলিত। তখনকার লোক অধার্ম্মিক ছিল না; বাণিজ্যের কপট মন্ত্র তখনও সৃষ্ট হয় নাই, তবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে অর্থ বিনিময়ের কেন্দ্র, এইরূপে যে বাণিজ্য চলিতেছে, সে কেবল কার্য্যের সুবিধা, অসুবিধা মাত্র। অর্থের দ্বারাই আজ কাল বিনিময় কার্য্য চলিতেছে; এই অর্থই বণিকদিগের সাধনার প্রশস্ত পথ। পৃথিবীর উন্নতি, দেশের অভাব মোচন প্রভৃতি বাণিজ্যের প্রধান উদ্দেশ্য সকল বর্ত্তমানে বণিকদিগের মন হইতে অবসর লইয়াছে, অন্যকে ফাঁকি দিয়া স্বীয় স্বার্থের অনুধাবন করাই বাণিজ্যের কপট মন্ত্র। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য্য যে বিনিময়ের মধ্যে অর্থ মধ্যবর্ত্তী না থাকিলে অনেক অসুবিধা হইত, হয়ত বর্ত্তমান প্রকারে বাণিজ্যের [illegible] উন্নত অবস্থাও হইত না; এমন কি, হয়ত কোন রাজ্য, উপরাজ্য আজ পৃথিবীর মধ্যে উচ্চতম ধনী রাজ্য বলিয়াও অভিহিত হইত না; এ কথা কে অস্বীকার করিতে পারে? কিন্তু যে বিনিময়তে আমার অর্থ সমূহ কাড়িয়া দেশান্তরে লইয়া যায়, আমার বাণিজ্যের

শ্রীবৃদ্ধির পরিবর্ত্তে, আমার অর্থে অন্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত করে; সে বিনিময়ের অপকারের কথা কেন না বলিব? * তুমি পৃথিবীর স্বার্থপর বণিক! তুমি বলিবে—"তুমিও এই প্রকার কর। কপট মন্ত্র দ্বারা পৃথিবীকে পরিশোভিত কর, যদি করিতে না পার, তবে বাণিজ্যের মধ্যে আসিও না।" মানবের ছলনা এর অপেক্ষা আর কি উৎকৃষ্ট ছবি দেখাইবে !!

সাম্য সংস্থাপন বাণিজ্যের অঙ্গ স্বরূপ। সাম্য অনেক প্রকারে স্থাপিত হইতে পারে। সংসারের বৈষম্য নানা প্রকার; ইহাদিগের অনেক বৈষম্যই বাণিজ্যে দূর হইত, কিন্তু বর্ত্তমান বাণিজ্য আরও অনেক প্রকার বৈষম্য আনিয়া সভ্য সমাজ সমূহে উপস্থিত করিতেছে। তুমি উৎকৃষ্ট বণিক, তুমি সংসারের অর্থ অপহরণ করিয়া স্বীয় কপট সাধনার বলে ঐ সুখের সংসারকে ধন বৈষম্যের দ্বারা পূর্ণ করিতেছ। আর তুমি ব্যবসায়ী,—তুমি সংসারে সখ্যভাব সংস্থাপনের ভান করিয়া, কলহ, বিবাদ, বিসংবাদের দ্বারা সংসারকে পরিপূর্ণ করিতেছ, এক রাজ্য ভাঙ্গিতেছ, আর রাজ্য গড়িতেছ; স্বীয় প্রার্থ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া, তোমার বৃথা এ ভান কেন? আর তুমি বণিকের বেতনভোগী ভৃত্য,—তুমিই বা এক রাজ্যকে হীনপ্রভ করিয়া, তোমার প্রভুর ক্রোড় উজ্জ্বল করিতেছ কেন? তোমার এই চাতুরীতে সংসারের কি উপকার হইতেছে? আর তুমি হে প্রবঞ্চক, বৃটিশ বণিক—তুমিই বা বৃথা ভান করিয়া, ছদ্মবেশে ভারতের উপকার করিবার ছলনে, দেশীয় রাজাদিগের সৈন্য সামন্তের সহিত চক্রান্ত করিয়া, রাজ্য কাড়িয়া লইতেছে কেন? ইহাতে তোমাদের স্বার্থপূর্ণ বই আর কি হইতেছে! কিন্তু তোমরা ত বলিতে কুণ্ঠিত নও যে, বাণিজ্যের উদ্দেশ্য সংসারের বৈষম্য দূর করা। † বাস্তবিক ধরিতে গেলে যেখানে বাণিজ্য, সেই খানেই রাজনীতি, সেই খানেই রাজনীতির কপট মন্ত্র। বাণিজ্যের মধ্যবর্ত্তী অর্থ থাকিয়া যত দিন বাণিজ্য চলিবে, তত দিন এই অসদ্ভাব আর দূর হইবে না। জাতীয় উদয়াস্ত এই হইতেই হইবে। যাঁহারা উৎকৃষ্ট বণিক, তাঁহারাই পৃথিবীর

---

* Any branch of trade which was supposed to send out more money than it brought in, however ample and valuable might be the returns in another shape, was looked upon as loosing trade. Prof. Mill's Pol. Eco.

† Adison's spectator Page 120 and 121.

শ্রেষ্ঠ রাজা। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অধোগতির কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেও আমরা ইহাই দেখিতে পাই, ভারতবর্ষীয়েরা চিরকাল ভক্তির জন্য প্রসিদ্ধ, ইহারা স্বীয় স্বার্থ সাধনের জন্য কোন কালে পরের স্বার্থ নষ্ট করে নাই ; এমন কি শ্রীকৃষ্ণ, কণিক এবং চাণক্য প্রভৃতি উৎকৃষ্ট রাজনীতিজ্ঞ থাকা সত্ত্বেও, ভারতবাসীরা কখনও অন্য দেশ লুণ্ঠন করিতে সাগরের পর পারে যান নাই ; চেষ্টাও করেন নাই। এ কথা বলা বাহুল্য যে, যাঁহাদের বুদ্ধিমত্তা সমস্ত পৃথিবীর আদর্শ, তাঁহারা চেষ্টা করিলে সমুদ্রে গমনোপযোগী পোত নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইতেন না ; কিন্তু সে রকম ইচ্ছা ছিল না বলিয়াই যে রাজ্যে যাঁহার অধিকার, তিনি তাহা রক্ষা করিতেই যত্নশীল রহিতেন। রাজনীতির কপট মন্ত্রে তাহারা দীক্ষিত হইতে পারেন নাই। তাঁহারা উৎকৃষ্ট বণিক হইতে শিক্ষা করেন নাই ; সুতরাং দিন দিন প্রভা হীন হইয়া অবশেষে মুসলমানদিগের কপট মন্ত্রের নিকট পরাস্ত হইয়া, রাজ্যভার ছাড়িয়া দিলেন ! সেই হইতেই ভারতবর্ষ অন্যের হাতের ক্রীড়ার বস্তু হইল ! হায় ! ভারতবর্ষীয়েরা আজও উৎকৃষ্ট বণিক হইতে পারিলেন না। বিধাতঃ ! এ শৃঙ্খল আর কতকাল থাকিবে ! !

বিভিন্ন দেশীয় দ্রব্যাদির বিনিময়ের উপর বাণিজ্য নির্ভর করে। বাণিজ্যের প্রধান উদ্দেশ্য অর্থ বৃদ্ধি বা অর্থ উৎপন্ন। উৎপন্নের মূল পরিশ্রম—মূলধন এবং জমি। এই তিনটীর সামঞ্জস্য ব্যতীত উৎপন্নের শ্রীবৃদ্ধি হয় না। * ইহাদিগের হ্রাস বৃদ্ধিতে উৎপন্নেরও ক্ষতি বৃদ্ধি হয়। ইহাদিগের বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক।

১ম পরিশ্রম। পৃথিবীতে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে আজ পর্য্যন্তও পরিশ্রমের নির্দ্দিষ্ট মূল্য ধার্য্য হয় নাই। কৃষক পৃথিবীর উৎকৃষ্ট পরিশ্রমী। অনুর্ব্বরা ভূমি উর্ব্বরা করিয়া, ভূমির অসারত্ব সার বস্তুর দ্বারা দূর করিয়া, রৌদ্র তাপে স্বীয় স্বীয় শরীর ক্ষয় করত, কৃষকেরা প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন করে। সেই শস্যের উপর পৃথিবীর জীবন। সুতরাং কৃষকই মানব জীবন রক্ষার উৎকৃষ্ট অবলম্বন। কিন্তু আজ পর্য্যন্তও কৃষকের পরিশ্রমের উপযুক্ত মূল্য ধার্য্য হইল না ; আর যে পর্য্যন্ত ধনলুব্ধ বণিকদিগের মধ্যে একটু দয়ার

---

* The Increase of production therefore, depends on the properties of these elements (Labour—Capital and land) Prof. Mill's. Pol. Eco.

সঞ্চার না হইবে, সে পর্য্যন্ত হইবেও না। জমিদারের ভয়ে, কৃষক নির্দ্দিষ্ট উৎপন্ন অপেক্ষা, উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারে না, কারণ সে বৃথা পরিশ্রম জমিদারের উদর পূরণের জন্য,—জমিদারের স্বার্থ সাধনের জন্য শেষ হইয়া যায়; তাহাতে কৃষকের কোন লাভ নাই। দ্বিতীয়তঃ, বণিকেরাই কৃষকদিগের পরিশ্রমের মূল্য নির্দ্ধারণকারী। কিন্তু অর্থ-লুব্ধ বণিকেরা এক পয়সাও পরিশ্রমের মূল্য বাড়াইতে স্বীকৃত নহে। ইহাতে অনেক কৃষক অন্নে প্রাণে মারা যাইতেছে। সেই জন্যই অনেকে আর এই কার্য্যে হাত দিতে স্বীকৃত হয় না। কৃষক সমস্ত বৎসর পরিশ্রম করিয়া যে শস্য সংগ্রহ করে, তাহা বণিকেরা যে অর্থে ক্রয় করিয়া লয়, তাহা তাহার এক মাসের আবশ্যকীয় দ্রব্যেই শেষ হইয়া যায়। কৃষকের পরিশ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার ভারতবর্ষে নাই বলিলেও চলে। বণিকদিগের কপট মন্ত্রে কৃষকেরা একেবারে উৎসন্ন যাইতেছে। তাহাদের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের সময় অধিক মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয়; কিন্তু তাহাদের পরিশ্রমের মূল্য নিতান্ত অল্প; অর্থাৎ কৃষকের ১১ মাসের পরিশ্রমের উৎপন্নের মূল্য, তাহার এক মাসের আবশ্যকীয় দ্রব্যেই শেষ হইয়া যায়; সুতরাং কৃষকের বাণিজ্য এক মাসেই বন্ধ হয়। এই জন্যই ভারতবর্ষে এত অসাম্য বিদ্যমান। যাঁহার প্রচুর পরিমাণে অর্থ আছে, সে অনায়াসে আমার সমস্ত বৎসরের পরিশ্রমের দ্রব্যাদি কিনিয়া লইল, আর আমি কৃষক—এত অল্প অর্থের অধিকারী হইলাম যে এক মাসেই আমার বাণিজ্য শেষ হইয়া গেল। কাজেই বলি, সংসারে পরিশ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার নাই বলিয়াই সমাজের অশেষ অনিষ্টের মূল—অসাম্যের এত আধিপত্য; আর উৎপন্নের মূল—কৃষকের অবলম্বন ভূমির এত দুরবস্থা। অন্য স্থানের কথা বলিতেছি না; ভারতবর্ষই আমাদের এক মাত্র লক্ষ্য। ভারতবর্ষে এইক্ষণ যে ক্ষেত্রে যে পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয়, কৃষকেরা চেষ্টা এবং যত্ন করিলে তাহার দ্বিগুণ শস্য উৎপন্ন হইতে পারে।* কিন্তু তাহারা যত্ন করে না, কারণ তাহাদের পরিশ্রমের উপযুক্ত মূল্য পায় না। অনেকে বর্ত্তমানে, মিলের (John Stuart Mill.) অনুসরণ করিয়া লোক সংখ্যা কমাইবার প্রস্তাব

* ব্যবসায়ী ১ম ও ২য় সংখ্যা।

করিয়া থাকেন *। কিন্তু কেহই পরিশ্রমের নির্দ্দিষ্ট মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করেন না। পরিশ্রমের পুরস্কার নির্দ্দিষ্ট না হইয়া যদি লোক সংখ্যা কমিয়া যায়, এবং কমাইবার চেষ্টা করা যায়, তাহাতে আরো উৎপন্নের অংশ কমিয়া যাইবে; এ কথা তাঁহারা একবারও ভাবেন না। এই জন্যই আমরা বলি, প্রথমতঃ পরিশ্রমের নির্দ্দিষ্ট মূল্য নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত।

দ্বিতীয়তঃ। পরিশ্রম বৃদ্ধিরও আবশ্যক। পরিশ্রমের বৃদ্ধি ধরিলেই সমগ্র মানব জাতির সংখ্যার বৃদ্ধি বুঝায়। এই পৃথিবীতে সম্পাদকীয় কার্য্য অনেক, সম্পাদক অল্প। সম্পাদক সংখ্যা অধিক হইলে কার্য্যের সুবিধা হয় সত্য, কিন্তু মনুষ্যমণ্ডলীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে, আবার অনেক প্রকার ক্ষতি হয়। সেই জন্যেই বিশ্বনিয়ন্তার সৃষ্টির মধ্যে সকলেরই পতন অনিবার্য্য। মানবের মধ্যে যতই কেননা বিজ্ঞানের উন্নতি হউক, বিজ্ঞানের সাহায্যে স্বভাবের উপর হস্তক্ষেপ করিবার যতই কেন ক্ষমতা হউক না, কিন্তু এই অনিবার্য্য পতনের গতিরোধ হয় না †। যদি হইত, তবে এ সংসার মানব মণ্ডলীর দ্বারা পরিপূর্ণ হইত; পৃথিবীর সম্পাদকীয় কার্য্যও শেষ হইয়া যাইত। স্বভাবের গতিরোধ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে; এমন স্থলে আমরা জীব বৃদ্ধির কামনা করি না। তবে সাময়িক জীব সমূহের মধ্যে সম্পাদক এবং পরিশ্রমীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, ইহাই আমাদিগের ঐকান্তিক বাসনা। ভারতবর্ষে অনেকে অন্যের উপর জীবিকা নির্ব্বাহের ভার অর্পণ করিয়া স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইতেছেন, —এ সংসারে অলসের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছেন। অস্মদ্দেশীয় একান্নভুক্ত পরিবার সমূহ ইহার উদাহরণ। এক জনের জীবনের উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করিয়া অনেক নব্য যুবক অলস হইয়া পড়িতেছেন। এ পৃথিবীতে কেহই স্বীয় কর্ত্তব্য ব্যতীত অন্যের কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম নহে। মনুষ্য জীবন ক্ষণস্থায়ী, সাময়িক কর্ত্তব্য কার্য্যাদি সম্পাদনের জন্য সাময়িক লোক সকলেই

---

* And what checks population is not multitude of deaths, but fewness of births.

Population is actually kept down by starvation. Mill's Pol. Eco.

† In the Human race (which is not generally subject to be eaten by other Species) the equivalents for it are death or disease. Prof Mill's. Pol. Eco.

দায়ী ; পক্ষান্তরে জীবনের ক্ষণ-স্থায়ীত্বে, কেহই দুই কিম্বা ততোধিক জীবনের কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে পারেন না ; তজ্জন্যই অলস ব্যক্তিদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য-গুলি অসম্পন্নই থাকিয়া যায়। এই জন্যই দেখা যায় সংসারের কর্ত্তব্য কার্য্য অনেক, সম্পাদক অল্প। আমরা এই অলস ব্যক্তিদিগকে পরিশ্রমী হইয়া স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য পালনের জন্য চেষ্টা করিতে, পরামর্শ দিতে কুণ্ঠিত নহি। আমা-দিগের দৃঢ় বিশ্বাস পৃথিবীর অলস লোকমণ্ডলী কর্ম্মিষ্ঠ হইয়া পরিশ্রমে নিযুক্ত হইলে, আর সম্পাদকের অভাব থাকিবে না।

দ্বিতীয়তঃ—মূলধন। বিগত পরিশ্রমের উদ্বর্ত্ত সামগ্রীর নাম মূলধন। মূল-ধন ব্যতীত উৎপন্ন সম্ভবে না। অর্থে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাকে উৎপন্নই বলা যায় না ; কারণ তাহা সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে অসম্ভব।* অর্থ নির্দ্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ : মূলধন সীমার অতীত। মূলধন সঞ্চয় করা সকলের জীবনে ঘটিয়া উঠে না। কেহ অতি কষ্টে উদরান্ন সংগ্রহ করিতেই সময় অতিবাহিত করিতেছেন ; কেহ বা প্রচুর পরিমাণে অর্থের উপর অর্থ ঢালিতে সক্ষম। মূল ধন ভবি-ষ্যতের চিন্তা হইতে উৎপন্ন হয়। যাঁহাদিগের ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য নাই, তাঁহারা মূল ধন সঞ্চয়ে তাদৃশ সুখ পান না। এই মূল ধনই বাণিজ্যের জীবন। একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, বিনিময়ের মধ্যবর্ত্তী অর্থ না থাকিলে, মূলধন ব্যতীতও ব্যবসা চলিতে পারে, কিন্তু যৎকালীন সে নিয়ম প্রচলিত নাই, তখন মূলধন ব্যতীত বাণিজ্য এক মুহূর্ত্তও চলিতে পারে না। কিন্তু এ প্রকার মূলধনের অধিকারী যাঁহারা, তাঁহাদিগের প্রায়ই বাণিজ্যের প্রতি লক্ষ্য নাই। ভারতবর্ষে মূলধনের অধিকারী বড় লোকমণ্ডলী এক প্রকার সুখ লালসার বশীভূত ; কেহই বাণিজ্য ব্যবসার প্রতি ভ্রমেও দৃষ্টিপাত করেন না। তজ্জন্যই ভারতবর্ষে বাণিজ্যের এত হীনাবস্থা। যাঁহারা মূলধনের অধিকারী, তাঁহারা কখনও তাহা ব্যয় করিতে স্বীকৃত নহেন। তাঁহারা জানেন না যে, বাণিজ্যের টাকা ব্যয় মধ্যে গণ্য নহে। এই মূলধনের প্রতি সকলেরই দৃষ্টি রাখা উচিত। কৃপণ সমাজের অপকারী জীব নহে ; কিন্তু অমিতাচারী মূলধনের অধিকারীর বৃথা অর্থ ব্যয়ে, সংসারের কোন স্থায়ী

* Money can not in itself fulfill any part of the office of capital, since it can afford no assistance to production. Mill's. Pol. Eco.

উপকার নাই।* বর্ত্তমান শতাব্দীতে অনেকে বিলাসপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহাদিগের বিলাসপ্রিয়তার জন্য মাসে মাসে শত সহস্র টাকা ব্যয় হইয়া যায়; এই অকারণ ব্যয়গুলি একটু সংযত হইলেও সংসারের অনেক উপকার হইত; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পাশ্চত্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, বিলাসপ্রিয় লোকের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি হইতেছে। যে দেশে, অযথা অর্থ ব্যয়কে বড় লোকেরা, উদার স্বভাবের চিহ্ন মনে করে, সে দেশের মঙ্গল কোথায়? বিশেষতঃ আজ কাল আবার পরিশ্রমীদিগের মধ্যেও বিলাসের চিহ্ন প্রবেশ করিতেছে। কৃপণতা বর্ত্তমান সময়ে ঘৃণার সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। কৃপণের সংখ্যা কমিয়া অমিতাচারীর সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি হইতেছে; ইহাতে যে দেশের সৌভাগ্য রবি অস্তমিত হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? আমরা যাঁহাদিগের অনুকরণ করিতে গিয়া বর্ত্তমানে অমিতাচারী হইয়া উঠিতেছি, আমাদিগের সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত, তাহারা অতি উচ্চ শ্রেণীর জীব!

তৃতীয়তঃ—জমি। বাণিজ্যের মূল কৃষি এবং শিল্প। কৃষি জমি হইতে উৎপন্ন হয়। এই জমির উর্ব্বরা শক্তির সহিত কৃষি উৎপন্নের বিশেষ সম্বন্ধ। কৃষির উন্নতির সঙ্গেই বাণিজ্যের উন্নতি। কৃষি ব্যতীত বাণিজ্য থাকিতে পারে না।† উৎপন্নের অবলম্বন কৃষি এবং শিল্প; এবং জমির উর্ব্বরতার উপর কৃষির উন্নতি; সেই জন্যই জমি উৎপন্নের প্রধান মূল। কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতির পূর্ব্বে এই জমির উন্নতি করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তুলনা করিয়া দেখা গিয়াছে,

---

* Of all vices, however, against which morality dissuades, there is not one more undetermined than this of avarice. Missers are described by some, as men divested of honor, sentiment, or humanity; but this is only an ideal picture, or the resemblance, at least is found but in a few. In truth, they who are generally called missers, are some of the best members of society. The sober, the laborious, the attentive, the frugal, are thus styled by the gay, giddy, thoughtless and extravagant. The first set of men do society all the good, and the latter, all the evil that is felt. Even the excess of first no way injure the commonwealth; those of the latter are the most injurious that can be conceived. Goldsmith upon Political frugality.

† ভারত-সুহৃদ পত্রিকা ৪র্থ সংখ্যা।

ভারতবর্ষের মৃত্তিকা কৃষির বিশেষ উপযোগী হইলেও, অন্যান্য দেশ হইতে ইহাতে অনেক অল্প পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয়। ইহার একমাত্র কারণ জমির হীনাবস্থা। যত দিন এই মৃত্তিকার উর্ব্বরতার জন্য সকলেই চেষ্টিত না হইবেন, তত দিন কৃষির তাদৃশ উন্নতি হইবে না; সুতরাং বাণিজ্যেও তাদৃশ লাভ হইবে না। আমাদের দেশীয় সামান্য লোকেরাই কেবল কৃষি ও বাণিজ্যে নিযুক্ত আছে, অথচ এই দুইটীই অর্থের প্রকৃত সোপান। ভারতবর্ষে যে সকল জমিতে বর্ত্তমানে কৃষি উৎপন্ন হইতেছে, সেই সকল জমিতেই বিশেষ চেষ্টা করিলে দ্বিগুণ শস্য উৎপন্ন হইতে পারে। এই মহাদেশে কৃষির জন্য কাহা-কেও বিশেষ কোন চেষ্টা করিতে হয় না, তাহার কারণ বীজ বপন করিলেই আবশ্যক মত শস্য উৎপন্ন হয়। আবশ্যকীয় বস্তুর অভাব না হইলে কে বৃথা পরিশ্রম করে? কিন্তু আবশ্যকীয় বস্তুর অতিরিক্ত কৃষিজাত দ্রব্যাদি উৎপন্ন না হইলে, বিনিময় চলিতে পারে না, কারণ বিনিময়ের দ্রব্য না থাকিলে কি প্রকারে তাহা চলিতে পারে? বিশেষতঃ বিনিময় করিলে যে তাহাদের লাভ হইবে, সে কথার মর্ম্মও তাহারা বুঝিতে পারে না; কারণ পরিশ্রমের নির্দ্দিষ্ট মূল্য নাই বলিয়াই তাহাদের দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ জমিদার। এই জমিদারেরাই জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতে দেয় না। যদি কোন কৃষক অর্থ লাভের আশায় দ্বিগুণ পরিশ্রম সহকারে স্বীয় ক্ষেত্র হইতে দ্বিগুণ শস্য উৎপাদন করে, তবে তাহা লইয়া জমিদার মহলে মহা গোলযোগ উপস্থিত হয়, এবং যে পর্য্যন্ত সেই উৎপন্নের কতক অংশ জমিদারের গৃহজাত না হয়, সে পর্য্যন্ত সে গোলযোগের শেষ হয় না। এই কারণেই কৃষকেরা জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে না। অন্যদিকে ভারতবর্ষের অধিকাংশ জমিই পতিত হইয়া রহিয়াছে; সে সকল ক্ষেত্রের কৃষক নাই। ভারতবর্ষে কৃষিকার্য্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক কেহই প্রবৃত্ত হয় না; অতি অল্প সংখ্যাই এই কার্য্যকে জীব-নের লক্ষ্য মনে করে। উত্তর বঙ্গ প্রদেশেরও এত জমি অনাবাদী হইয়া আছে যে, সে সকল জমিতে কৃষি করিলে প্রচুর পরিমাণে ধন উৎপন্ন করা যাইতে পারে, কিন্তু কেহই সে চেষ্টা করে না। বর্ত্তমানে যে সকল শস্য উৎপন্ন হই-তেছে, তাহার অধিকাংশই আবশ্যকে লাগে; অতি অল্প অংশ যাহা অবশিষ্ট থাকে, তদ্দ্বারাই বাণিজ্য চলিতেছে। সে বাণিজ্যকেও বাণিজ্য বলিতে পারি না, কারণ তাহা ব্যবসা বিশেষ। কৃষকের উৎপন্ন বিদেশীয় বণিকের হস্তে

প্রদান করাকে ব্যবসা বই আর কি বলিব? যে পর্য্যন্ত সমস্ত লোকমণ্ডলী প্রাণপণে, অহঙ্কার, মান, মর্য্যাদা পরিত্যাগ করিয়া কৃষি কার্য্যে নিযুক্ত না হইবেন,—জমির উন্নতির চেষ্টা না করিবেন, সে পর্য্যন্ত দেশের উন্নতি অসম্ভব। উৎপন্নের অংশ বৃদ্ধি না হইলে কখনই ধন বৃদ্ধি হয় না। তজ্জন্যই আমরা বলি প্রথমতঃ উৎপন্নের মূল কৃষির উন্নতি সাধনে সকলেরই যত্ন করা উচিত, তারপর অবশেষে বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করিলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য লাভ করা যাইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই, কেহই আজ পর্য্যন্ত এই প্রকৃত ধন উৎপন্নের মূলের দিকে ফিরিয়াও দেখেন না। এ দেশের আবার উন্নতি!!

মূল ধন ব্যতীত উৎপন্ন অসম্ভব, কারণ উৎপন্নকারী পরিশ্রমীদিগের ভরন পোষণ কার্য্য এই মূলধনই সমাধা করে। কতক টাকা এতদর্থে ব্যয় না হইলে উৎপন্নের সম্ভাবনা কোথায়? এবং এতদর্থে যে অর্থ সঞ্চিত থাকে, তাহাই মূল ধন। * বিলাস বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য, যে অর্থ ব্যয় হয়, তাহা মূলধন নহে, কারণ তাহাতে উৎপন্নের সহায়তা করে না। অনুৎপাদক শ্রমের জন্য যে অর্থ ব্যয় হয়, তাহাও মূলধন নহে, কারণ তাহা কেবল শ্রমজীবীদিগের ভরণ পোষণেই নিঃশেষিত হয়। উৎপাদক শ্রমের জন্য যে অর্থ ব্যয় হয়, তাহাই মূলধন; কারণ একদিকে যেমন তাহাতে শ্রমজীবীদিগের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হয়, সেই প্রকার আবার মূলধন সৃজনের সহায়তা করে।

বাণিজ্য কি, এই কথা বলিতে গিয়া আমরা আরো কতকগুলি কথা বলিয়া ফেলিলাম। বাণিজ্য দ্বারা দেশের অভাব বিমোচন হয় সত্য, কিন্তু সময়ে যে আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করে, এ কথা আমরা ভুলিতে পারিব না। স্বভাবের যে সকল দ্রব্যাদি ব্যতীত মানবের জীবন সংস্থান অসম্ভব, সেই সকল দ্রব্যাদির মধ্যে বাণিজ্যের বিনিময় ক্রিয়া সম্পন্ন হইলেই সুখ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি

* That the capital of a country is that portion of its wealth which is appropriated to reproductive purposes. But if wealth is so appropriated, it must be employed in assisting those who produce wealth. But the producers of wealth are the labourers, therfore capital remunerates the labourers; or, in other words, the capital of the country is the fund out of which the labourers are paid their wages. H. Fawcett's Pol, Eco.

হয়, নচেৎ কেবল বিলাসের জন্য—(যে কারণে আধুনিক বাণিজ্য এত প্রসিদ্ধ) বিনিময় করিলে উভয় পক্ষের কখনই সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয় না, বরং প্রকৃত পক্ষে দেশের অনেক প্রকার অমঙ্গল ঘটে। এই প্রকার বাণিজ্য দ্বারা দেশ বিশেষ বা জাতি বিশেষ যে পৃথিবীর মধ্যে উচ্চ স্থানীয় হইয়া উঠিয়াছে, একথা অস্বীকার করি না, কিন্তু পক্ষান্তরে অন্য দিকে চাহিয়া দেখিলে, অন্য দেশ বা জাতির অবনতি দেখিলে, হৃদয় দুঃখে অবসন্ন হইয়া পড়ে!! ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের তুলনা করিলেই আমরা এ তর্ক মীমাংসার উৎকৃষ্ট উদাহরণ পাই। দিন দিন ভারতবর্ষ একেবারে অর্থ শূন্য হইয়া পড়িতেছে! এই মহা প্রদেশের অর্থ যাইয়া ইংলণ্ডে রাশিকৃত হইতেছে। ভারতবাসীদিগের মধ্যে, বর্ত্তমানে, বাণিজ্য ব্যবসায়ে পারদর্শী লোক নিতান্ত অল্প; এমন স্থলে বর্ত্তমান প্রচলিত ব্রিটিষ আদর্শের বাণিজ্য ছাড়িয়া অন্যান্য বিষয়ের আলোচনায় কোন ফল হইবে কি না, সন্দেহ স্থল। এই জন্যই আমরা বাণিজ্য সম্বন্ধীয় অন্যান্য কথা বলিতে ক্ষান্ত রহিলাম।

বাণিজ্য দুই প্রকার—অন্তর বাণিজ্য এবং বহির্বাণিজ্য। অন্তর বাণিজ্যে যে সকল উপকার লাভ হয়, তাহা অপেক্ষা বহির্বাণিজ্যের উপকারের পরিমাণ অধিক; কিন্তু তুলনায় বিপদের আশঙ্কাও অনেক। অন্তর বাণিজ্য কিম্বা ব্যবসায়ে অভাব দূর হয় বটে, কিন্তু দেশের অর্থ বৃদ্ধি হয় না; কৃষি এবং শিল্পে মূলধনের যে অংশ বৃদ্ধি করে তাহাই থাকিয়া যায়। অন্তর বাণিজ্য দেশ মধ্যেই প্রচলিত থাকে, এই জন্যই এই বাণিজ্যের নাম 'ব্যবসা।' বহির্বাণিজ্যে প্রকৃত পক্ষে অন্য দেশের অর্থ আনিয়া দেশের অর্থের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। কিন্তু বহির্বাণিজ্যে সুখ, দুঃখ, উভয়ই সমান।

প্রাচীন কালে কোন্ স্থানে এই বাণিজ্যের সৃষ্টি হয়, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। ইতিহাস সকল সময়ে উত্তর করিতে সক্ষম নহে। বাণিজ্য সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে হইলেই আমাদিগকে ইউরোপের সাহায্য লইতে হয়। কারণ ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন। এই অন্ধকারের মধ্যে স্থানে স্থানে বৈদ্যুতি থাকিলেও তাহাতে কোন উপকার হয় না। নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে অনুসন্ধান করিতে করিতে অস্মদ্দেশীয় পুরাবিদপণ্ডিতগণ বাণিজ্যের সপক্ষে দুই চারিটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শে না। এক শত বৎসরের একটী ঘটনা, দ্বিতীয় শত

বৎসরের আর একটী ঘটনার সহিত সংযোগ করিয়া, ইতিহাসের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে কেহই সক্ষম নহেন। আর সে সকল বৈদ্যুতি থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে আজ পর্য্যন্তও কোন প্রকার বাণিজ্যের ইতিহাস লিখিত হয় নাই। তবে আমরা মধ্যে মধ্যে ভারতবর্ষের গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য যে সকল কথার উল্লেখ করিয়া থাকি, সে সকল কেবল ভারতবর্ষের পুরাকালীয় বাণিজ্যের চিহ্ন স্বরূপ। শ্রীমন্ত সওদাগর একবার সমুদ্রে ডিঙ্গা সাজাইয়াছিলেন, একথা সকল স্থানেই শুনিয়া থাকি। বালিতে হিন্দুধর্ম্ম এবং শ্যাম ও চীন প্রদেশে বৌদ্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, এ সকল কথাও আমরা জানি। কিন্তু জানিয়াও প্রকাশ্যে বলিতে ইচ্ছা করে না। ভারতবর্ষে পুরাকালে বাণিজ্য ছিল, এই কথার প্রমাণ করাই যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয়, তবে 'বাণিজ্য' এই তিনটী কথার সহিত বাঙ্গালা ভাষার কত দূর সম্বন্ধ, তাহা হইতেই আমরা সে প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি। পুরাকালে কোন প্রকার ব্যবসা প্রচলিত না থাকিলে "বাণিজ্যে বশতেলক্ষী" প্রভৃতি উৎকৃষ্ট উপদেশের কথা আমরা শুনিতে পাইতাম না। তবে কথা এই, ভারতবর্ষে কোন্ প্রকার বাণিজ্য প্রচলিত ছিল? তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট ইতিহাস পাওয়া যায় না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অন্তর বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধি হয় না। তবে পূর্ব্বে কেবল অন্তর বাণিজ্য এ প্রদেশে প্রচলিত থাকিলে, বাণিজ্যের প্রতি এত সমাদর কখনই থাকিত না। বহির্বাণিজ্য ভিন্ন অর্থ বৃদ্ধি হয় না। যাহা হউক এ প্রশ্নের মীমাংসা করা তত সহজ ব্যাপার নহে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনেক বিখ্যাত ইউরোপীয় পণ্ডিত মণ্ডলী * অনুসন্ধান করিয়া ঠিক করিয়াছেন,—ভারতবর্ষের বাণিজ্য স্পেণ প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। কিন্তু তাহার প্রমাণ সকল আজ পর্য্যন্তও বিশ্বাসযোগ্য হয় নাই। যাহাই হউক ভারতবর্ষীয়েরা যে বাণিজ্যের আদর বুঝিতেন, তাহা ঐ এক শ্লোকেই প্রমাণ করে। এমন কি তাঁহারা বাণিজ্যের গুণ কীর্ত্তনে মত্ত হইয়া কৃষি,—ধন উৎপাদনের মূলাধারকেও দ্বিতীয় শ্রেণী ভুক্ত করিয়াছেন।

---

* প্লিনি প্র-তৎ সাময়িক বৃত্তান্তে বর্ণিত আছে।

দিল্লির রাজসূয় যজ্ঞ।*

আগামী ১লা জানুয়ারি, বৎসরের প্রথম দিনে, মহারাণী ভিক্টরিয়া, সমুদ্র বেষ্টিত শ্বেত বৃটনে বসিয়া, ভারতবর্ষের প্রাচীন মহানগরী দিল্লিতে 'এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া' ভারতেশ্বরী, উপাধি গ্রহণ করিবেন, এই ঘোষণায় কেবল দিল্লি নহে, সমস্ত ভারতবর্ষ আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইংরাজ রাজের সাধনার ফল, যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহা এতদিনে সম্পূর্ণ লইল! অৰ্দ্ধ শতাব্দীর ও পূর্ব্বে, ইংলণ্ডবাসী যে মন্ত্র পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ে, শত সহস্র বাধা বিপত্তির পরে, আজ সেই মন্ত্র সাধনার উৎকৃষ্ট ফল ফলিল! দিল্লির সম্রাটগণ যাহা করিতে সক্ষম হয়েন নাই, মোগল, পাঠানগণ যাহা করেন নাই, বিদেশীয় যোদ্ধৃপুরুষগণ যে কীর্ত্তি ধ্বজা ভারতবর্ষে উড়াইতে সক্ষম হয়েন নাই, আজ ইংলণ্ডবাসী—সেই পূর্ব্বতন বণিকদিগের মন্ত্রের যথার্থ সুখপ্রদ পুরস্কারে অধিকারী হইতেছে, ইংরাজ মহলে আনন্দের সীমা নাই, ইংলণ্ডের আজ একটী দিন!!!

আজ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ—আজ পৃথিবীর উচ্চাভিলাষ সকল ক্রমেই রাজনীতির নিগূঢ়তম প্রদেশে যাইয়া আবদ্ধ হইতেছে, পৃথিবীর সকলেই রাজনীতি রূপ মহামন্ত্র পরিগ্রহ করিয়া, তাহারই সাধনায় রত রহিয়াছে। আজ পৃথিবীর সকল শ্রেণীর লোকেই রাজনীতির মূলতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া স্বীয় স্বার্থ অন্বেষণে ব্যস্ত! আমাদিগের মহারাজ্ঞীর নূতন উপাধি গ্রহণের মধ্যে যে কি রাজনীতির গূঢ়তত্ত্ব রহিয়াছে, সে কথার উল্লেখ করিবার জন্য আমরা লেখনী ধরি নাই। যে মহানগরীতে পূর্ব্বতন আর্য্যগণ রাজসূয় যজ্ঞের সূত্রপাত করিতেন; যে স্থানে একদিন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সিংহাসন শোভা পাইতেছিল, আজ সেই স্থানে বিদেশীয়, বিজাতীয় রাজার নাম ঘোষিত হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষ প্রতিধ্বনিত করিবে, এই সকল মর্ম্মভেদী কথা স্মরণ করাইয়া উদ্দীপনা করিবার জন্য ও আজ আমরা এই প্রশ্ন লইয়া আন্দোলন করিতেছি না। ভারতবর্ষ—যেমন আছে, তেমনি থাকিবে; ভারতবর্ষ রাজনীতির উচ্চ আসনের যোগ্য নহেন, এই কথা যখন আমাদের অন্তঃকরণে প্রবেশ করে, তখন হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে যে মর্ম্মভেদী দুঃখ নিশ্বাস আপনা আপনি

---

* ১২৮৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসের ভারত-সুহৃদ পত্রিকা হইতে পুনর্মুদ্রিত।

বহির্গত হয়, আমরা সকল সময়ে তাহা থামাইতে সক্ষম হই না। আজ দিল্লির দরবার সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলা ও আমাদের হৃদয়ের দুঃখ নিঃসরণ মাত্র।

ভারতবর্ষ চিরকাল রাজ ভক্তির জন্য প্রসিদ্ধ। বহুকালব্যাপী ভারতের ইতিহাসে রাজবিদ্রোহের কথা কোথায়ও দেখা যায় না। বিজাতীয় রাজার প্রতি ভারতবাসীর প্রগাঢ় ভক্তি চিরদিনই লক্ষিত হয়। একথা বুঝাইবার জন্য আর বিশেষ কোন চেষ্টার আবশ্যক করে না। কুমারিকা হইতে হিমাচল পর্য্যন্ত ভারত যে জয় ঘোষণায় ব্যাপৃত, ইহাই তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ! শত সহস্র নির্যাতনেও ভারতবাসীর মন বিচলিত হয় নাই—হইবার নহে। বৃটীশরাজা এ ভক্তির অনেক উদাহরণ পাইয়াছেন; কিন্তু পাইয়াও যে প্রকার কঠোর শাসন দ্বারা দুর্ভাগ্য ভারতবাসীদিগকে নির্যাতন করেন, সে সকলও একাল পর্য্যন্ত সহ্য হইয়া আসিতেছে। আজকাল অনেক সংবাদ পত্রে অনেক রাজনীতির কথা প্রকাশিত হইয়া থাকে,—রাজনীতি সম্বন্ধীয় অনেক নিগূঢ় তত্বের আলোচনা হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু তাহা কেবল মাত্র কথায়ই শেষ হয়। এটী ভারতবাসীর পক্ষে না হউক, ইংলণ্ডের পক্ষে শুভলক্ষণ বটে। কিছুদিন পূর্ব্বে বর্ত্তমান দরবার সম্বন্ধেও অনেক কথা অনেক সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন আমরা ভাবিয়াছিলাম—অন্ততঃ সম্পাদকগণ ভারতবর্ষে এই সময়ে নিরানন্দের সাজ পরিয়া, বর্ত্তমান যজ্ঞে ভারতের সুখ নাই, ইহার উদাহরণ দেখাইবেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ তাঁহারাও স্বীয় স্বীয় নিমন্ত্রণ পত্রে গৌরবান্বিত হইয়া, আহ্লাদিত মনে, দিল্লি যজ্ঞে আহুতি প্রদান করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। কাজেই বলি, ভারতবর্ষের রাজনীতি আজ কাল উপহাসের হইয়া উঠিয়াছে। কাহারও মন্ত্র পরিগ্রহ নাই,—কাহারও সাধনা নাই। কথার কথা না বলিলে নয়; তাই ভারতে রাজনীতি—রাজবিরুদ্ধে লেখনী চালন! জ্ঞান শূন্য ভক্তি প্রসিদ্ধ দেশে উন্নতির আশা বিফল!

জ্ঞান কৌশলময় রাজনীতিতে আর ধর্ম্মের এক অঙ্গ অন্ধ ভক্তিতে চির-বৈষম্য বিরাজিত। যেখানে রাজনীতি সেখানে অন্ধভক্তি থাকিতে পারে না, আবার অন্ধভক্তির মধ্যেও রাজনীতির কপট মন্ত্র প্রবেশ করিতে পারে না। ভারতবর্ষ চিরকালই অন্ধ ভক্তির জন্য প্রসিদ্ধ, তবে আজ কাল যে রাজনীতির উদ্দীপনার সূত্রপাত হইয়াছে, সে সকল কথার কথা। কালে,

এই বীজে যে কি ফল উৎপাদন করিবে, তাহা যাঁহারা ভাবী কালের মধ্যস্থিত ফলাফল গণনা করিতে সক্ষম, তাঁহারাই বলিতে পারেন। ভারতবর্ষে 'পূর্ব্বের সে গৌরব নাই—সে রাজা নাই—সে রাজনীতি নাই—সে কবি নাই—সে কবি কানন নাই, এ সকল কথার উল্লেখ করিয়া যে সকল যুবক মস্তক বিলোড়িত করিতেছেন, তাহাদের সাধনার অঙ্গ সকল ঠিক থাকিলে, একদিন তাঁহারাও বুঝিতে পারিবেন। মনের একটী স্বাভাবিক শক্তি আছে,—সে শক্তি শিক্ষায় প্রস্ফুটিত হইলেই মন্ত্র পরিগ্রহ আবশ্যক হইয়া পড়ে; আজ কাল ভারতবাসীরা যে সকল মন্ত্র গ্রহণ করিতেছেন, এ সকল কেবল তর্কের কথা বই, আজ পর্য্যন্তও কিছুই নহে; কারণ কার্য্যকালীন প্রায়ই সে মন্ত্র রক্ষা হয় না। স্বায়ংকালে যে মন্ত্র গ্রহণ করি, রজনী প্রভাত হইতে না হইতে, যখন আর সে মন্ত্র ঠিক রাখিতে সক্ষম হই না, তখন আর মন্ত্র গ্রহণের সার মর্ম্ম আমরা কি বুঝিয়াছি? আজ যে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, কাল যখন আবার এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে কুণ্ঠিত হই না, তখন আমাদের প্রতিজ্ঞায় কি ফল ফলিবে? কল্য আমরা উচ্চৈস্বরে বলিয়াছি—বর্ত্তমান দরবারে আমাদের সুখের কিছুই নাই, কিন্তু দুই দিন না যাইতেই, আমরা আবার আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া তাহাতে যোগ দিতে প্রবৃত্ত হইতেছি! কি আশ্চর্য্য! যুবকবৃন্দের কথা দূর হউক,—দেশের বিজ্ঞ সম্পাদক মাহাশয়েরাও যখন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেন, তখন আর আশা কোথায়? আর যদি বুঝিয়াছিলাম যে আমাদিগকে এই প্রকারই করিতে হইবে, তবে লেখনীর দ্বারা দুঃখের কাহিনী নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে প্রচার না করিলে, কি ক্ষতি ছিল? ভারতবাসীর অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা ঘটিয়াছে,—আর ভবিষ্যতে যাহা আছে, তাহা ঘটিবে; সে সকল কথা উল্লেখ করিয়া বৃথা দুঃখ প্রকাশ না করাই শ্রেয়। তবে কথা এই, দিল্লির রাজসূয় যজ্ঞে ভারত অঙ্গ ঢালিয়া নৃত্য করিতে অগ্রসর হইতেছেন কেন? যাহাতে আমাদের স্বার্থ আছে, তাহাই আদরের এবং তাহাতেই আমরা আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া থাকি; কিন্তু বর্ত্তমান যজ্ঞ অধিষ্ঠানে আমাদের স্বার্থনাশ বই, স্বার্থ সিদ্ধির আশা কোথায়? একথা লইয়া দিন কয়েক অনেক প্রশ্ন উঠিয়াছিল, আমরা আজ আবার এই প্রশ্ন তুলিলাম। আমাদিগের মন আছে, সহানুভূতির জন্য, ইন্দ্রিয় আছে, সহানুভূতির ভাব প্রকাশ করিবার জন্য। আমরা বর্ত্তমান দুঃখের সময়,—স্বার্থনাশের সময়, দুঃখ প্রকাশ না করিয়া,

আহ্লাদের বেশে সজ্জিত হইতেছি কেন? সুখ, দুঃখ আমাদের প্রত্যেক দিনের ঘটনার ব্যাপার। স্বার্থনাশই জীবনের দুঃখ, স্বার্থ সিদ্ধিই সংসারের সুখ। আজ মহারাজ্ঞী ভিক্‌টরিয়া, সাগরের পারে বসিয়া, ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণ করিতে বসিয়াছেন, তাঁহার সাধনার বলে তিনি অলৌকিক লীলা খেলায় মত্ত হইয়াছেন, তাঁহার মনের ভাব কি, তাহা আজ পর্য্যন্তও প্রকাশিত হয় নাই; আমাদের স্বার্থ সিদ্ধ হইবে কি না তাহা আজ পর্য্যন্তও ভাবী কাল গর্ভে নিহিত, কিন্তু যে সকল স্বার্থের পথে কণ্টক পড়িতেছে, তাহা প্রত্যহ নয়ন উন্মীলন করিয়া জ্ঞাননেত্রে দেখিতেছি, বুঝিতেছি, তবে আমাদের হর্ষের কারণ কি? ভিক্‌টরিয়া ভারতের রাজ্ঞী, তাঁহার শাসনে ভারতের অনেক অভাব দূর হইয়াছে। তাঁহার নিকটে ভারত অনেক বিষয়ে ঋণী, সুতরাং তাঁহার উন্নতিতে ভারতের আমোদ বই বিষাদ নহে! কিন্তু স্বার্থত্যাগ করিয়া কে কবে পর উন্নতিতে আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছে? জ্ঞান শূন্য ধর্ম্মের কথা আমরা এস্থলে গ্রহণ করিব না। কোন্ রাজনীতিজ্ঞ স্বীয় স্বার্থ ত্যাগ করিয়া পরের উন্নতিতে নৃত্য করিয়াছেন? ভারতের বর্ত্তমান ত্যাগস্বীকার সামান্য নহে। ঐতিহাসিক ঘটনানিচয়ে এই স্বার্থ নাশের কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবে। চিরকাল—চিরদিন ইতিহাসে লেখা থাকিবে; যদি ভারত কখনও স্বীয় মুখ উজ্জ্বল করিতে সক্ষম হয়, তখনও এই স্বার্থ ত্যাগের কথা,—বিজাতীয় গৌরব অপনীত হইবে না!

মহারাণী নূতন উপাধি গ্রহণেও ভারতের সুখ আছে। দুঃখের কথা আমরা এইক্ষণ স্পষ্ট করিয়া বিবৃত করিব না। ভারতের সুখ! ভারত চিরকাল ত্যাগস্বীকারের জন্য প্রসিদ্ধ, আজ সেই ত্যাগস্বীকারের উৎকৃষ্টতম উদাহরণেও ভারতবাসীর মন বিচলিত হইতেছে না, এ কথা অজ্ঞান ধার্ম্মিকের নিকট সুখের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু সমস্ত পৃথিবীর রাজনীতিজ্ঞেরা কখনই ইহাকে সুখের বলিবে না। যখন নূতন উন্নতিশীল আমেরিকা,—নব উত্থিত জর্ম্মানি উচ্চৈস্বরে বলিবে "এই পৃথিবীতে যাঁহারা রাজনীতির কপট মন্ত্রে আজ পর্য্যন্তও দীক্ষিত না হইয়া, অকাতরে স্বীয় রাজ্যেরও ত্যাগস্বীকার করিতে পারেন, তাঁহারা ধার্ম্মিক বটে,—তাঁহাদের সহিষ্ণুতা যথার্থই আছে; এবং আজ ভারতবর্ষ দায়ে পড়িয়া যে ত্যাগস্বীকারেও আমোদে উন্মত্ত হইয়াছে, এ ত্যাগস্বীকার রাজনীতির অপরিক্কতা হেতু ধর্ম্ম ভারের স্পষ্ট উদাহরণ,'—

তখন আমরা—ভীরু বাঙ্গালী—যাহাদের রাজনীতি কেবল কথায় আবদ্ধ, এ সুখের যথার্থ মর্ম্ম বুঝিতে পারিব। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জ্ঞান-শূন্য ধর্ম্ম আর জ্ঞানময় রাজনীতি এক স্থানে থাকিতে পারে না, জ্ঞান ছাড়িয়া ধর্ম্ম চাও, ত্যাগ স্বীকার কর। জ্ঞান লাভের জন্য রাজনীতি চাও—স্বীয় স্বার্থ নাশে কখনই সুখী হইও না। ভারতবর্ষ ত্যাগ স্বীকারেও সুখী—ভারতবর্ষ জ্ঞান বিবর্জ্জিত ধর্ম্মের জন্য প্রসিদ্ধ; তবে ভারতবর্ষে আবার রাজনীতির আন্দোলন কেন? যেখানে ত্যাগস্বীকারে সুখ আছে—সেখানে রাজনীতি থাকিতে পারে না। তবে বৃথা মনে একভাব, বাহিরে আর এক কথা বলিয়া চিৎকার করিলে কি হইবে? জর্ম্মানি—আমেরিকার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর,—দেখিবে, স্বার্থ নাশে অন্তর পর্য্যন্ত দগ্ধ হইয়া যাইবে। এক কথায় জ্ঞান বিবর্জ্জিত ধর্ম্ম চাও ত ভারতবর্ষ ছাড়িও না, আর রাজনীতিজ্ঞ হইবার অভিলাষ থাকিলে, যত শীঘ্র পার, ভারতবর্ষ ছাড়িয়া ইউরোপ এবং আমেরিকায় গমন কর; ভারতবর্ষ রাজনীতির স্থান নহে। ভারতবর্ষে যদি সুখ থাকে এবং বর্ত্তমান রাজসূয় যজ্ঞে যদি বাস্তবিকই সে সুখের অভ্যুদয় হইয়া থাকে, তবে আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, সে সুখ এই জ্ঞান বিবর্জ্জিত ধর্ম্মভাব হইতে উঠিয়াছে। কিন্তু সময়ের যে প্রকার গতি দেখা যায়, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হয়, ভারতে এইক্ষণ আর সে প্রকার জ্ঞান বিবর্জ্জিত ধর্ম্মভাব নাই; তবে আমরা কেন অকারণ আহ্লাদে মত্ত হইয়া উঠিতেছি? বৃটীশ শাসন পরম সুখের হইলেও, জাতীয় পক্ষপাতিতায় ভারতের যে ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহা আমরা বিস্মৃত হইতে পারিব না। আমাদের ক্ষমতা নাই, সে এক কথা—ক্ষমতা নাই, সহ্য না করিয়া কি করিব, সেও আর এক কথা। সহ্য করিতেছি, করিব। যে আগুন অন্তরে অহর্নিশ ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে, সে আগুন নিবিবে না—নিবাইবার ক্ষমতা আমাদের নাই। কথা বলিলে মুখবন্ধ করিতে পারে, তাহা জানি। বিগত দুই বৎসর হইতে যে আইন গুলি, যে যে বিষয় উপলক্ষে প্রচারিত হইল, তাহাও জানি;—জানিয়া চুপ করিয়াই থাকিতে ইচ্ছা করে; কথা বলিতে সাহস হয় না—ইচ্ছাও করে না। যাঁহাদের মনে অহর্নিশ আগুন জ্বলিতেছে—তাঁহাদিগের আবার বাহিরে হাসি কেন? একথা আমরা বুঝিতে পারি না।

আজ ভারতবর্ষে কাহার মনে সুখ আছে? কাহার না অন্তরে আগুন

জ্বলিতেছে? শৈশব অবস্থা লোকের কত দিন থাকে? এক কথায়, আজ ভারতের সকলই ঘোর বিষাদে সমাচ্ছন্ন। অন্য কথা সমূহ দূর হউক! অন্য কথার উল্লেখ করিব না। সে দিন পূর্ব্ব বাঙ্গলার লক্ষ লক্ষ লোক হঠাৎ জলে ভাসিয়া গেল, এবং এইক্ষণও অস্বাভাবিক রোগে, অন্নাভাবে কত লোক প্রাণে বঞ্চিত হইতেছে! বম্বে, মান্দ্রাজে শত সহস্র লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছে, এ সকল যাহার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে, তাহার মনে এক মুহূর্ত্তের জন্যও সুখ নাই! বালকদের কথা ছাড়িয়া দেও,—নির্ব্বোধদিগের কথা উদাহরণে আনিও না; দেখত কয়জন বিজ্ঞলোকের মন না ব্যাকুল হইয়াছে? অন্তরে এত দুঃখ থাকিতেও আমরা সদাই আনন্দে থাকিতে অভ্যাস করি, এটা আমাদের দোষ নহে, যেহেতু কার্য্যে ঘটায়; বিপরীত ভাব ধারণ করিলে দণ্ডনীয় হইতে হয়, তাহাও জানি; কিন্তু তত্রাচ বলি,—সমস্ত ভারতবর্ষ যদি এই সময়ে বিষাদে অবনত মস্তকে থাকিতে পারিত, তাহা হইলে ইহার যে দৃশ্য হইত, সে দৃশ্য প্রার্থনীয়, সে সহৃদয়তা চির বাঞ্ছনীয়। আজ সমস্ত ভারতবর্ষ যদি সমতানে, এই স্বার্থনাশের সময়, ক্রন্দনের ধ্বনি আকাশ স্পর্শ করাইতে পারিত, তবে ইংলণ্ড, আমেরিকা, জর্ম্মানি, ফরাশি বুঝিত 'ভারত রাজনীতির গূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইয়াছে।' আজ যদি সমস্ত ভারত দুঃখের বেশ পরিধান করিতে পারিত, তবে জগৎ চক্ষু মেলিয়া দেখিয়া অবাক্ হইত, ইতিহাসে এই কথা চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিত।

দৈব বিড়ম্বনা ব্যতীতও শত সহস্র স্বার্থ নাশের কথা আমরা এইক্ষণ উল্লেখ করিতে পারিতাম, কিন্তু রাজার এই সুখের সময় আমরা ভাবী অনিষ্টের গান এইক্ষণ গাইব না, ভারতবাসীরা বুঝিতে পারেন, বুঝিবেন; কিন্তু ইহা নিশ্চয় বলিতে পারি, ইহাতে কাহারও ভাবী সুখের আশা নাই। সিপাহি যুদ্ধের পর কম্পানির রাজ্য রাজ্ঞীর হস্তে সমর্পিত হইলে আমরা যে প্রকার উপকারের আশা করিয়াছিলাম, এবং যাহা পাইয়াছি, ইহাতে তদপেক্ষা আরো কত কি পাইব—কত কি সহ্য করিব,—কে জানে? আজ দেশ যে আমোদে মাতিয়া উঠিয়াছে, এই আমোদের শেষ ফল—চির ক্রন্দনে পর্য্যবসিত হইবে না, কে জানে? তত্রাচ ভারত হাসিবেই, কাঁদিবে না! বিধাত! আমাদের এ বালকত্ব আর কত দিনে ঘুচিবে!!

আমাদিগের অভাব।

উন্নতি, মানবের সংক্ষিপ্ত জীবনের একমাত্র আদর্শ,—সকলেই ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হইতেছেন; কিন্তু উন্নতি সম্বন্ধীয় সম্পূর্ণতা লাভ সম্যক-রূপে কখনই মনুষ্য জীবনে ঘটে না। অপরিসীম স্থায়ী উন্নতির সম্পূর্ণতা,—ক্ষুদ্র রুচীর বৈপরীত্যের শেষ সীমা, কখনই কোন জীবনে পূর্ণ অবস্থায় অবতীর্ণ হয় নাই। আশার বস্তু যত পাওয়া যায়, তত আরো পাইবার ইচ্ছা হয়,—বাঞ্ছিত দ্রব্য যত ভোগ করা যায়, তত আরো ভোগ ইচ্ছা হৃদয়ে বলবতী হয়;—ক্ষণকালের ভোগ, উপভোগে মানবের তৃষ্ণা নিবারিত হয় না। পক্ষান্তরে যাহার মন যে বিষয়ে অনুরক্ত, তাহার মনে সেই বস্তু পাইবার ইচ্ছা সর্ব্বদাই বলবতী। ধন, জন, বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, ভালবাসা, শারীরিক এবং মানসিক বল—এ সকল যাহার জীবনে একবার, রূপান্তরেও দেখা দিয়াছে, তাহার মন এ সকলের প্রতি যত ধাবিত, অন্যের তত নহে। 'আমার জীবনের উচ্চাভিলাষ সকল সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হইয়াছে' এ কথা কেহই বলিতে পারেন না। ধনীর আর ধনলাভে অভিলাষ নাই, বিদ্বানের আর বিদ্যালাভে পূর্ব্বের ন্যায় অভিরুচি নাই * এ কথার সাপেক্ষ প্রমাণ আজ পর্য্যন্তও পাওয়া যায় নাই। মনুষ্য, বাহ্যিক অবস্থা ও রীতি নীতি যতই উন্নত হউক না কেন, উন্নতির শেষ সোপানে অধিরূঢ় হইতে কেহই সক্ষম নহে; তবে এই পর্য্যন্ত কেহ জীবন অভিনয়ের শেষ পটক্ষেপণের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে প্রায় সমুদয় প্রচা-রিত উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে পারেন, আর হয়ত কেহ প্রথম সোপান পরিত্যাগ করিতে না করিতেই অভিনয়ের শেষ তানে লীন হন।

সমাজ মনুষ্য মণ্ডলীর সমষ্টি মাত্র। যখন প্রত্যেক মনুষ্যের মনই অসম্পূর্ণ, তখন অংশের সমষ্টি মূল—সমাজ ও অসম্পূর্ণ, তাহাতে আর সংশয় কি? পৃথিবীর সকল সমাজই কোন না কোন বিষয়ে অসম্পূর্ণ। হয়ত কোন কোন সমাজ অপেক্ষাকৃত অধিক উন্নত; কিন্তু কোন সমাজই সম্পূর্ণ উন্নত অবস্থায় আজ পর্য্যন্তও অধিরূঢ় হইতে পারে নাই—ভবিষ্যতে পারিবে কিনা, তাহাতেও সন্দেহ আছে।

পৃথিবীর সমস্ত লোক সমুন্নত হইলে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে, ভিন্ন ভিন্ন সমাজ

---

* বঙ্গীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্র ইহার বিপরীত।

সমূহে, সভ্যতা, রীতি, নীতির এত তারতম্য থাকিত না, সামাজিক বিভিন্নতা তিরোহিত হইত; কিন্তু নানা প্রদেশীয় ভিন্ন ভিন্ন সমাজে এত তারতম্য—এত বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়—যে এক দেশের সভ্যতা অপর দেশের অসভ্যতার লক্ষণ—এক দেশের জ্ঞান, অপর দেশের সামান্য শিক্ষা বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। আমরা যে প্রকার আচার ব্যবহারকে সভ্যতার লক্ষণ মনে করি, অপর প্রদেশে হয়ত তাহাকে অসভ্যতা বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারে। সংক্ষেপে ব্যক্তিগত মত, সমাজগত আচার ব্যবহার, পরস্পর এত বিভিন্ন যে সরল চক্ষে কোন্‌টী উন্নত কোন্‌টী অবনত; তাহা ঠিক করা যায় না; হয়ত আজ যাহাকে উন্নত অবস্থা ভাবিতেছি, তাহাও কালে অবনত বোধ হইতে পারে। গত জীবনের সকল কার্য্যের প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, সকলেই এ কথা বুঝিতে পারিবেন।

অভাবের বিষয় জ্ঞাত হওয়া এবং সেই অভাব দুরীকরণের ইচ্ছা ও চেষ্টাই জাতীয় উন্নতির লক্ষন। অভাব জ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গেই অভাব বিমোচনের বাসনা হয়, চেষ্টা সকলের হয় না; যাহাদের চেষ্টা হয় তাহাদের সেই অভাব বিমোচনের সঙ্গে সঙ্গে আরো অভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। আর যাহাদের চেষ্টা হয় না, তাহারা সমস্ত জীবন সেই একটী অভাব লইয়াই অতিবাহিত করিতে বাধ্য হয়। যত অভাব দুর হয়—তদপেক্ষা অধিক অভাব আসিয়া মানব সমক্ষে উপস্থিত হয়। উন্নতির অভাবের শেষ নাই, তজ্জন্যই আমরা দেখিতে পাই, যে সমাজ যত উন্নত, অর্থাৎ যে সমাজে অভাব হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছা ও চেষ্টার সামঞ্জস্য আছে, সেই সমাজেই তত অভাব অধিক এবং সেই সমাজই তত উন্নত।*

'উন্নত সমাজের অভাব অধিক'—প্রকৃতপক্ষে ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে ইহাই দেখা যায়, মানসিক শক্তি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়—পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ বিষয় ধারণে সক্ষম হয়। বাল্যকালে মনোবৃত্তি সকল

---

* অভাব দুই প্রকার—একটী কোন বিষয় সম্পূর্ণ জ্ঞানের অতীত—অর্থাৎ তাহার আবির্ভাবের বিষয় আমরা জানি না এবং এ প্রকার অভাবকে আমরা উন্নতিব লক্ষণ মনে করি না।

দ্বিতীয়তঃ—আংশিক অভাব—একটী বিষয় যখন আংশিক পরিমাণে জ্ঞানের সমক্ষে উপস্থিত হয়; এবং অন্যান্য অংশ জ্ঞানের অতীত থাকে। এই আংশিক পরিমাণের অভাবকেই আমরা জাতীয় উন্নত অবস্থার লক্ষণ মনে করি—এবং ইহা প্রায়ই জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে অধিক হয়।

নিস্তেজ থাকে, সেই বৃত্তি সকল ক্রমে ক্রমে যখন সবল হইতে থাকে, তখনই চিন্তা শক্তির ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। পূর্ব্বে একটী বিষয় যে মন ধারণ করিতে পারিত না—একটী বিষয় যে মন চিন্তা করিতে পারিত না, সময়ে সেই মন শত সহস্র বিষয় চিন্তা করিতে পারে। চিন্তা শক্তির সহিত জ্ঞানের সামঞ্জস্য হইলে অভাব সকল আমরা জ্ঞাত হইতে পারি; এই দুইটির একটীর অভাবে ও আমরা সকল অভাব জ্ঞাত হইতে সমর্থ হই না। এই জন্যই বয়ঃক্রম সহকারে যখন চিন্তা শক্তির এবং জ্ঞানের অভ্যুদয় হইতে থাকে, তখনই একটী একটী অভাব বুঝিতে পারা যায়। এই সকল অভাব প্রাকৃতিক, ইহা প্রায়ই বয়ঃক্রমের সঙ্গে সঙ্গে মানব সমক্ষে উপস্থিত হয়, এবং এ সকল প্রায় সমস্ত জীবনেই ঘটিয়া থাকে। শরীর পোষণার্থ আহার, তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পানীয় দ্রব্য—শরীর আবৃত করিবার জন্য বস্ত্র, বিশ্রাম জন্য আবাস স্থান, এ সকল সকলেই জানে। কিন্তু কৃত্রিম অভাব সমূহ (অর্থাৎ যাহা প্রাকৃতিক বয়ঃক্রম অনুসারে সকলের মনে উপস্থিত হয় না) কেবল মানব মনের তীক্ষ্ণ প্রতিভার পরিচালনার ফল মাত্র। জ্ঞানের সঙ্গে বুদ্ধি বৃত্তির ক্ষমতা ও বিবেচনা শক্তি যখন চিন্তার সহিত ঐকমত্য হইয়া পড়ে, তখনই এই সকল অভাব উপস্থিত হয়। পরিচালনা করিতে করিতে জ্ঞান চক্ষু যত উন্নত হইতে থাকে, ততই জগতের অভাব সকল তীক্ষ্ণ প্রতিভার সমক্ষে উপস্থিত হয়। জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই অভাবের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে। একটী অভাব দূর হইতে না হইতে আরো কত অভাব আসিয়া লোকের,—সমাজের উন্নতি বিষয়ক অভাবের দ্বার মোচন করে। এ সকল অভাব অসভ্য জাতির নিকট অলীক স্বপ্নে পরিণত। উন্নতির শেষ নাই—সুতরাং অভাবেরও শেষ নাই।

দেশ কাল ভেদে নানা দেশীয় লোকের মন নানা বিষয়ে অনুরক্ত—সেই অনুরক্ত বিষয়ের বিভিন্নতাতে নানা দেশের রুচী নানা প্রকার;—বহু সংখ্যকের মতে যে রুচী ভাল, সেই রুচীই ভাবী সমাজের বীজ স্বরূপ হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয় এবং এই বীজের আধিক্যতা অনুসারেই লোকমণ্ডলী, সমাজ সমূহ সভ্যতার উচ্চ পদে আরূঢ় হইয়া পৃথিবীকে উজ্জ্বল করিয়াছে। পৃথিবীর কোন্ সমাজে এই বীজ সংখ্যা অধিক এবং কোন্ সমাজ কত উন্নত—সে বিষয়ের সমালোচনা আমরা করিব না। বর্ত্তমান প্রস্তাবে দেশীয় লোকমণ্ডলীর প্রধান অভাবগুলি প্রদর্শন করিয়াই লেখনী রাখিব।

বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমরা ১ম—শিক্ষাপ্রণালী; ২য়—জাতীয় একতা; ৩য়—বিজাতীয় অনুকরণে আসক্তি; ৪র্থ—দেশীয় পূর্ব্ব প্রচলিত আচার ব্যবহারের প্রতি অমনোযোগ—এই চারিটী বিষয়ের দোষজনক অভাব সমূহ প্রদর্শন করিব।

১ম—শিক্ষাপ্রণালী—বর্ত্তমানে সকলেই প্রায় ইংরাজি স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া 'এম এ বিত্র' উপাধিধারী হইয়া সমাজকে উজ্জ্বল করিতেছেন। পূর্ব্বের প্রচলিত টোল্ প্রভৃতি সংস্কৃত শিক্ষা স্থানের কথা এইক্ষণ আর তত শুনা যায় না। স্থানে স্থানে থাকিলেও স্থানীয় লোক সকল প্রায়ই তাহার প্রতি বিরক্ত ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন; অনেকে সেই টোল সমূহের ছাত্র এবং অধ্যাপকগণকে ঘৃণা করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। শিক্ষার প্রধান কারণ অভিজ্ঞতা, গৌণ কারণ অভাব দূরা করা অর্থাৎ অর্থ বা দেশের উন্নতি; বর্ত্তমান শতাব্দীতে গৌণ কারণকেই প্রধান কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছে। অভিজ্ঞতা লাভ সংস্কৃত টোল প্রভৃতিতেও হইতে পারে; কিম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ স্কুলেও হইতে পারে। কিন্তু একটীর প্রতি বর্ত্তমানের অনাদর, অন্যটীর প্রতি এত আদর কেন? অধ্যয়নেই অভিজ্ঞতা লাভ করা যাইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমানে কলেজের—ইংরাজী কলেজের প্রতি এত আদর কেন? ইহার কারণ আমরা আর কিছু দেখি না। অর্থ এবং আবশ্যকতার কেন্দ্র নির্দ্দেশ করিয়াই সকলে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন এবং তজ্জন্যই বঙ্গীয় নব্য যুবকদিগের কলেজের সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষা এবং অধ্যয়নের পর্য্যবসান হয়।

বিদ্যাভ্যাসের প্রধান কারণ আজ কাল অর্থ উপার্জ্জন এবং রাজ প্রসাদ লাভ; এই দুইটী কারণেই অনেকে বিদ্যা-শিক্ষার জন্য এত লালায়িত। যাহারা নির্ধন তাহাদের মনে স্বতঃই অর্থের বাসনা বলবতী। এই বাসনার বশবর্ত্তী হইয়াই এই দল শিক্ষা পথের কণ্টক পরিস্কার করিতে যত্নবান। আর যাহারা ধনী, তাঁহাদের মনে 'রাজ প্রসাদ' লাভের ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল। সুতরাং সমাজের এইদল প্রাণপণ করিয়া রাজ প্রসাদ লাভ করিবার জন্যই ব্যস্ত। বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজি শিক্ষা ব্যতীত এ দুয়ের কিছুই লাভ করা যায় না, তজ্জন্যই আজ কাল বিদেশীয় শিক্ষার এত আদর। অন্য ভাষায় এ দুয়ের একটীরও লাভের সম্ভাবনা নাই, সুতরাং অন্য ভাষা চিত্ত বিনোদক নহে। জাতীয় ভাষা ভিন্ন কোন দিন কোন জাতি উন্নতি লাভ করিতে পারে

নাই ; আমাদের দেশের লোক সেই উন্নতির মূল জাতীয় ভাষাকে ঘৃণার সহিত দেখিয়া থাকেন। বিশেষতঃ সংস্কৃত যে উৎকৃষ্ট ভাষা, তাহা (ইউরোপে ইহার প্রশংসা বাহির হইয়াছে পর) সকলেই স্বীকার করেন, অথচ ইহার প্রতিও তাচ্ছল্য ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। যে দুইটী কারণে বিদেশীয় ভাষার প্রতি লোকের এত আসক্তি জন্মিয়াছে ; তাহা অধুনা কত দূর সঙ্গত, তাহাই দেখা আবশ্যক। বর্ত্তমান শিক্ষার ১ম উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জ্জন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-ধারী ব্যতীত আজ কাল কেহই গবর্ণমেণ্টের সরকারে চাকুরির যোগ্য নহেন ; এইজন্যই সকলে একাগ্র মনে এই একটী কেন্দ্র নির্দ্দেশ করিয়া শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। এই উপাধি লাভ করিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত। এ প্রকার উৎসাহ শিক্ষা পথের উত্তেজক, সন্দেহ নাই। লক্ষ্য বস্তুর প্রতি মনকে স্বতঃই ধাবিত করা উচিত স্বীকার করি, কিন্তু সময়ে সময়ে যাহারা এই লক্ষ্যে উপনীত হইতে না পারেন, তাঁহাদিগের প্রতি লোকের এত অশ্রদ্ধা কেন ? আবার যাহারা এ প্রকার উৎসাহজনক উপাধির অযোগ্য তাঁহাদিগের মনেই বা কষ্ট হয় কেন ? অর্থ উপার্জ্জনের সহিত মনুষ্যত্বের সম্বন্ধ অতি অল্প। পক্ষান্তরে অর্থের পথ আজ কাল এত অপ্রশস্ত হইয়াছে যে, সমস্ত জীবন এই পথের অনুসরণ করিয়াও কেহ, কেবল জীবন ধারণ ব্যতীত, অন্য কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন না ; তবে চাকুরির এত অভিলাষ কেন ? তাহার কারণ ইংরাজি শিক্ষায় আর কিছু হউক বা না হউক, চাকুরির পিপাসা শতগুণে বৃদ্ধি পায় ; তাই শিক্ষার জন্য—উপাধির জন্য মন এত ধাবিত। এই জন্যই লক্ষ্য বস্তু না পাইলে যে কষ্ট হয়, তাহা অনেকেই সহ্য করিতেছেন। ইংরাজি শিক্ষার প্রধান গুণ এই, ইহার সঙ্গে সঙ্গেই বিলাসপ্রিয়তা আসিয়া উপস্থিত হয়। অর্থ বিলাসপ্রিয়তার চির সহচর। অর্থের পিপাসা সহজেই কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অধিক। এই অর্থের পথে কত কণ্টক—কত অপমান—কত পদাঘাত! তত্রাচ ইহার প্রতিই সকলের মন ধাবিত। সমস্ত শরীর, মন ক্ষয় করিয়া যাই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'এম এ, উপাধিধারী হইলেন, অমনিই ২০ টাকার চাকুরি জুটিল—কত সুখ, কত আনন্দ প্রবাহ ! এই ২০ টাকার মধ্যে কত অপমান, কত পদাঘাত, তত্রাচ ইহাতেই সুখ ! লক্ষ্যের বস্তু এত ক্ষীণ—এত দুর্ব্বল, তথাপি এই পথেই হাঁটিতে হইবে ; শরীর মন ক্ষয় হয় হউক, তাহাতে ক্ষতি কি ?

ফাক্ পাইলেই পলায়নের জন্য অস্থির হয়। ব্যাঘ্রকে শৈশব সময় হইতে ঘরে রাখিলেও, উপযুক্ত বয়সে তাহাদের রুচী মাংসের দিকে ধাবিত হয়; এবং 'মাতৃলম্ফ' প্রদান করিয়া শিকার করণ প্রথা মনে উপস্থিত হয়। এ সকল তাহাদিগকে শিখাইতে হয় না, আপনা আপনিই মনে উদয় হয়, ইহাকে ইতর প্রাণীর স্বাভাবিক প্রতিভা বলে। কিন্তু মনুষ্যের সে প্রকার নহে। অতি শৈশব অবস্থায় লোক সমাজ হইতে শিশুকে অন্ধকারে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে, তাহাদিগের প্রকৃতি—আচার ব্যবহার সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া পড়ে। বাল্যাবস্থা হইতে সন্তানেরা প্রায় অনুকরণ করিয়াই উন্নত হয়; তাহারা অল্প বয়সে যাহা দেখে, যাহা শুনে, তাহাই অভ্যাস করে। এই অনুকরণ ইচ্ছা বাল্যাবস্থা হইতে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত জীবনের অবলম্বন। যে সমাজে যে প্রকার আচার ব্যবহার প্রচলিত, তাহাই অনুকরণের আদর্শ। দেশ কাল তারতম্যে সন্তানগণের মধ্যগত সাধারণ বৈষম্য সকল পরিত্যাগ না করিলেও দেখা যায়, দেশীয় দোষ গুণ ভিন্ন অন্য কিছু লইয়া সন্তানেরা জন্মগ্রহণ করে না। সাময়িক লোকেরাই সন্তানগণের উন্নতির বা অবনতির আদর্শ; অতএব সামাজিক লোকের রুচী উন্নত হইলে যে তাহাদিগের রুচী ও উন্নত হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি? এই জন্যই আমরা বলি, শিশু সন্তানদিগকে ভাল ভাল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া মনুষ্যত্বের উপযোগী করা উচিত। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই সন্তানগণের জন্য কষ্ট করা দূরে থাকুক, তাহাদিগের আচার ব্যবহার, রীতি, নীতির প্রতিও বর্ত্তমান সাময়িক লোকদিগের আর মন নাই। পৃথিবীতে পাপের স্রোত এত প্রবল যে, অল্প সময়ের মধ্যে পবিত্র কোমল মতি শিশু সন্তানদিগের চিত্তেও পাপ রেখা অঙ্কিত হয়; অসাময়িক সংসার কীটে শরীর ও মনকে ক্ষত বিক্ষত করে, এ সকল বিষয়ে অভিভাবকদিগের একবারও দৃষ্টি পড়ে না। পূর্ব্বতন বিশ্বাস প্রযুক্তই হউক কিম্বা অন্য কোন আনুষঙ্গিক কারণেই হউক, ভাবী ভারতের গৌরব স্বরূপ সন্তানদিগকে কতিপয় স্ত্রীলোকের হস্তে ন্যস্ত করিয়াই মনের সুখ শান্তি অনুভব করিয়া থাকেন।

স্বীয় জীবনগত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, সন্তানগণকে উন্নত করা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না, এই জন্যই অন্যান্য উপায় আদরনীয়। প্রতিভাশালী সৎ লোকের জীবন বৃত্তান্ত তাহাদিগকে অভ্যস্ত করিতে দেওয়া

উচিত। ভাল ভাল জীবনের উপদেশ পূর্ণ ঘটনাবলী তাহাদিগকে আদর্শ স্বরূপ অভ্যস্ত করাইলে, তাহাদিগের কোমলমতি যে ক্রমে ক্রমে সেই দিকে আকৃষ্ট হইবে, সে বিষয়ে আর সংশয় কি? অল্প বয়স্ক বালক-দিগের মন সরল এবং কোমল; তাহাদিগকে যে প্রকার নত করা যায় সেই প্রকারই নত হয়; যে প্রকার শিক্ষা দেওয়া যায় সেই প্রকারই শিক্ষিত হয়, এমন স্থলে উন্নত জীবনের আদর্শে, তাহাদিগের ভাবী উন্নত অবস্থার বিষয়ে, কেহই সন্দেহ করিতে পারেন না। কিন্তু এ প্রকার শিক্ষার জন্য কাহাকেও যত্ন করিতে দেখা যায় না। ভারতবর্ষে ইতিহাসের আস্বাদন আজ পর্য্যন্ত কেহই পায় নাই। অন্যের জীবন পাঠ করিয়া, অন্য দেশীয় সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয় শিক্ষা করিয়া, অন্য দেশীয় স্বাধীন জীবনের সুখ অনুভব করিয়া, ভারতবর্ষীয়েরা আজ পর্য্যন্তও সুখ অনুভব করিতে শিক্ষা করেন নাই। শিশু সন্তান হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত, সকলেরই অন্যের জীবন পাঠ করিলে কিছু শিক্ষা করিবার থাকিতে পারে। এ শিক্ষার সারত্ব আজ পর্য্যন্তও এদেশের কেহই বুঝিতে সক্ষম হন নাই। অন্য জাতির দৃষ্টান্ত ব্যতীত জাতীয় উন্নত অবস্থা স্বপ্নের ন্যায়; ভারতবর্ষে এ দৃষ্টান্ত ভ্রান্তি-মূলক। অনেকই, ভারতকে উন্নত অবস্থাপন্ন ভাবিয়া, মনে শান্তি ও সুখ লাভ করিতে-ছেন বটে, কিন্তু কয় জন লোক ইতিহাস বিষয়ক জাতীয় প্রকৃত উন্নতির কণ্টক পরিষ্কার করিয়া ভারতের মুখ উজ্জ্বলে যত্নবান হইয়াছেন? অনেকেই 'ভারত উন্নত' হইয়াছে বলিয়া আস্ফালন করিয়া থাকেন; কিন্তু যে প্রদেশে ইতিহাসের চর্চ্চা একেবারেই নাই, যে প্রদেশ ইতিহাসকে জাতীয় উন্নতির অবলম্বন বলিয়া স্বীকার করে না, সে স্থান উন্নত, কি প্রকারে স্বীকার করিব? সাহিত্য,—তর্কশাস্ত্র, বার্ত্তাশাস্ত্র, গণিত, দর্শন, এ সকলের প্রকৃত আস্বাদন 'ভারতে' অনেকেই পাইতেছেন। কিন্তু ইতিহাসের কথা কয়-জনে ভাবিয়া থাকেন? ভারতবর্ষীয় বিদ্যালয় সমূহে ইতিহাসের চর্চ্চা হয় সত্য, কিন্তু কয়জন লোক ইতিহাস হইতে জ্ঞান লাভ করিবার মানসে, ইহা পড়িয়া থাকেন? পক্ষান্তরে ইতিহাসের স্থানে, অন্য কোন বিষয় ধার্য্য হইলে, অনেকের মনই আহ্লাদিত হইবে, ইহারও পূর্ব্ব লক্ষণ পাওয়া যায়। মাসিক পত্র, সাপ্তাহিক পত্রিকা, দৈনিক কাগজ এ সকলের আর ভারতে অভাব নাই, কিন্তু এ সকলের কয়খান কাগজে ইতিহাসের চর্চ্চা থাকে?

কোন কোন পত্রিকায় থাকিলেও পাঠকগণ সে অংশ একেবারে পরিত্যাগ করেন। ইতিহাস সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি প্রায়ই অপঠিত থাকে। সংক্ষেপে, ইতিহাসের আস্বাদন ভারতে আজ পর্য্যন্তও কেহই পায় নাই; পাইলে, অন্য কত প্রকার পুস্তক হইতেছে, ইতিহাস হয় না কেন? অনেকেই আক্ষেপ করিয়া থাকেন, ভারতবাসীদিগের মধ্যে পূর্ব্বে কোন ইতিহাস লেখক ছিল না বলিয়াই, পূর্ব্ব গৌরব স্বপ্নের ন্যায় বোধ হয় এবং সেই জন্য মনে ধিক্কার জন্মে। আমরা বলি পূর্ব্বে ছিল না—সে কষ্ট আমরা অনুভব করিতেছি, কিন্তু ভাবী ভারত সন্তানগণের জন্য আমরা কি করিতেছি? আমাদের মধ্যে কয় জন লোক ইতিহাস সংগ্রহ করিতেছেন? দেখিতে দেখিতে এই উনবিংশ শতাব্দীতে কত ঘটনা ঘটিল, কিন্তু এমনি কর্ম্মের ভোগ, ইহার বিবরণ ইংরাজি গ্রন্থ ব্যতীত আর কোথাও নাই। বিদেশীয়েরা আমাদের গৌরব লিখিতে কত দূর পটু, তাহা বিগত সিপাহি বিদ্রোহ সময়ের বিবরণেই বিবৃত আছে। যে বিদ্রোহের কথা মনে পড়িলে, আমাদের মন সাহসে উদ্দীপ্ত হয়—এই নৈরাশ মনেও আশার সঞ্চার হয়, সেই ঘটনাবলী কি না সংক্ষেপে দুই চারিটী ইংরাজী গৌরবে আরম্ভ হইয়া ইংরাজী গৌরবেই শেষ হইয়াছে! সে সকল কথা দূর হউক। এই ভারতবর্ষে কত শত অলৌলিক গুণসম্পন্ন লোক জন্মগ্রহণ করিয়া, অকালে জীবন লীলা সম্বরণ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন; তাঁহাদিগের রত্নপূর্ণ জীবনকে সময়ের পটলে পটলে মিলাইয়া যাইতেছেন; কিন্তু কোন নিদর্শন থাকিতেছে না। এই সকল মহাত্মাদিগের কথা মনে পড়িলেও কত আশার অঙ্কুর হয়; কিন্তু, তাঁহাদিগের জীবনের কোন ঘটনাই পুস্তকাকারে দেখিতে পাই না। তাঁহাদিগের জীবনে এত রত্ন ছিল যে—উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়া ভোগ করিলেও তাহা নিশেঃষিত হইত না; তাঁহাদিগের অভিনয় শেষ হইল—সময় স্রোত বহিয়া গেল;—তাঁহাদিগের রত্নপূর্ণ জীবন সময়ের অভেদ্য জঞ্জালে ঢাকা পড়িল, কোন চিহ্ন রহিল না। দেখিতে দেখিতে ভারতে যে সকল অদ্বিতীয় লোক মানবলীলা সম্বরণ করিলেন, তাঁহাদের জীবনে কি এমন কোন রত্ন ছিল না, যাহাতে ভাবী ভারতের উপকার হইত? কিন্তু কি দুর্ভাগ্য! ভারতবাসী তাহার মর্ম্ম বুঝে না, ইতিহাসে যে সকল উপকার হয়, তাহা জানিয়াও জানে না, বুঝিয়াও বুঝে না।

রত্ন প্রসূতী ভারতমাতা কত শত শত রত্নপ্রসব করিয়াছিলেন, এবং করিতেছেন কিন্তু কয় জনের পূর্ণ জীবন চরিত আমরা দেখিতে পাই? মানিলাম অনেকের জীবন চরিত আছে, কিন্তু প্রধান প্রধান ঘটনা ব্যতীত জীবনের প্রত্যাহিক ঘটনা সম্বলিত কয় জনের জীবন বৃত্তান্ত আছে? দৈনিক ঘটনা কয়জন ভারত-বাসী নিয়মিত রূপে লিখিয়া থাকেন? আমাদের প্রদেশে এখন ও দৈনিক ঘটনাবলীর আস্বাদন পায় নাই; তবে কেমন করিয়া পোড়ামুখে স্বীকার করিব, ভারত উন্নত হইয়াছে! বিজাতীয় গৌরব, বিজাতীয় শোভা পরিত্যাগ করিলে, দেখি ভারত অন্ধকারে আচ্ছন্ন; ভারতসূর্য্য এখন ও উদিত হন নাই। কেবল পর রত্নে স্বীয় ক্রোড় উজ্জ্বল করিয়া চীৎকার, আমোদধ্বনি করিলে কি হইবে, ভারত আজ পর্য্যন্ত ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন!

বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের উন্নতি ব্যতীত জাতীয় অভাব দূর হয় না। বল, বীর্য্য, স্বাস্থ্য—শরীরের যাহা কিছু আবশ্যক, এ সকলই বিজ্ঞানের উন্নতির উপর নির্ভর করে। আবার অন্য কথা,———তাহাতো বিজ্ঞান ব্যতীত সাধিত হইতেই পারে না; কিন্তু এই বিজ্ঞানের প্রকৃত উন্নতি আদৌ হইতেছে না। কলেজের ছাত্রগণ যাই বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িলেন, অমনিই সব বিস্মৃতি সলিলে বিসর্জন দিলেন। যাঁহারা একটু যত্ন সহকারে বিজ্ঞান শিখিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের দ্বারাও দেশের উপকারের সম্ভাবনা নাই—কারণ বিস্মৃতি এবং স্বার্থের পথ ছাড়িয়া যদি দুই একটী লোক আসিলেন, তাহা-দিগেরও ক্ষমতা নাই যে, আশু সমাজের কোন উপকার করিয়া উঠিতে পারেন। অর্থহীন উৎসাহী যুবকের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে, কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতি কি অর্থ ভিন্ন হইতে পারে? ভারতের কলেজ সমূহে যে বিজ্ঞানের চর্চ্চা হয়, তাহাতে কোন উপকারই হইতে পারে না, কারণ তাহাকে যথার্থ বিজ্ঞান না বলিলেও চলে; এমন স্থলে দেশের কি প্রকারে উন্নত অবস্থা হইবে, আমরা বুঝিতে পারি না। ভারতবাসীর মন দুর্ব্বল সুতরাং বিজ্ঞানের গূঢ়তম প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে চায় না। যে দেশে বিজ্ঞানের চর্চ্চা নাই, সে দেশের অপেক্ষা আর হীনাবস্থা যুক্ত দেশ কোথাও নাই।

দ্বিতীয়তঃ। জাতীয় একতা। ধর্ম্মই জাতীয় একতার মূল। আধুনিক নব্য সম্প্রদায়ের কোন ধর্ম্মেই দৃঢ়বিশ্বাস নাই। ধর্ম্ম বিশ্বাস স্বভাবতঃই মনে উদয় হয়, কিন্তু শিক্ষার প্রাবল্যে স্বভাবগত বিশ্বাস ক্ষণকাল মধ্যেই চলিয়া

যায়; এটী নব্য যুবকদিগের মূল মন্ত্র। ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টীয়ান, মুসলমান, হিন্দু, এ সকলেই পরস্পর বিভিন্ন হইয়া বর্ত্তমানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি সম্পন্ন লোক বলিয়া পরিগণিত। কাহারও প্রতি কাহারও শ্রদ্ধা নাই, পরস্পর পরস্পরের বিদ্বেষী, এই জন্যই ভারতবর্ষে, "ভাই ভাই কাটাকাটি।" ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া আজ পর্য্যন্ত কেহই একতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষে অনেক যুবকই স্বাধীনতার পক্ষপাতী, কিন্তু ধর্ম্মের কথা শুনিতেও পারেন না; ইহার অপেক্ষা আর কি ভ্রম হইতে পারে? ধর্ম্ম ব্যতীত একতা থাকিতে পারে না; একতা ভিন্ন কে কবে স্বাধীন হইতে পারিয়াছে? ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই, যেখানে ধর্ম্মের একতা, সেই খানেই মনের একতা; যেখানে মনের একতা সেইখানেই স্বাধীনতা। ইউরোপ ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ স্থল। যে পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে এই ধর্ম্মের একতা না হইবে, সে পর্য্যন্ত আর মনে মন মিলিবে না; সে পর্য্যন্তই অনৈক্য জাল দেশময় পরিব্যাপ্ত থাকিবে, সুতরাং সে পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের মঙ্গল নাই।

তৃতীয়তঃ। বিজাতীয় অনুকরণে আসক্তি। ৪র্থতঃ। দেশীয় আচার ব্যবহারের প্রতি অমনোযোগ; আমরা এই দুইটী একত্র করিয়া লইলাম। আমাদিগের বিশ্বাস, যখন বিজাতীয় অনুকরণ ইচ্ছা হৃদয়ে বলবতী হয়, তখনই দেশীয় রীতি নীতির প্রতি ঘৃণা জন্মে, একটীর বর্ত্তমানে অন্যটীর আদর সম্ভবে না।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডবাসীগণ ভারতবাসীগণের অনুকরণের একমাত্র আদর্শ। দেশীয় আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতিতে আর নব্য সম্প্রদায়ের মনকে হরণ করে না। সকলই পরিবর্ত্তন হইতেছে। পরিধেয় বস্ত্র, আহারীয় দ্রব্য, পানীয় বস্তু, অন্তরের প্রণয়, স্নেহ, ভক্তি, বিনয়, সরলতা সকলই রূপান্তরে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বের ভারতবর্ষ এইক্ষণ আর নাই; এইক্ষণ ভারতবর্ষে বৃটিশ জয়পতাকা উড়িতেছে। স্থির মনে যখন বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা করি, তখন ভাবি, বৃটিশ অবলম্বন ব্যতীত ভারতশূন্য। আজ যদি বৃটিশ * * * তবে কাল দেখি চতুর্দ্দিক অন্ধকারময়!

আক্ষেপের বিষয় এই, এত সভ্যতার স্রোত বহিতেছে, তত্রাচ কেহই দেশের প্রকৃত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখেন না, অপিচ দিন দিনই অনুকরণের ইচ্ছা প্রবল হইতেছে। দেশীয় বস্ত্রের স্থানে মানচেষ্টারের

রাজত্ব!! আমাদের দেশীয় ধুতিতে আর আধুনিক সভ্য সম্প্রদায়ের মান রক্ষা হয় না! দেশীয় শীতল জল পান করিলে আর তৃষ্ণা নিবারিত হয় না! সাক্ষাৎকালীন ঈষৎ শির-কম্পন এবং হস্ত চালন ব্যতীত চলে না, আর প্রণয়—সে কথা আর কি বলিব! অন্তরে প্রণয় থাকুক বা না থাকুক, সে বিষয়ে কাহারও মন নাই; আড়ম্বরে কম না হইলেই হইল। ভাল ভাল কথার সম্বোধন, ভাল ভাল পরিচ্ছদ দ্বারাই আজ কাল প্রণয়ের স্থান অধিকৃত হইয়াছে। অনেকে আবার স্ত্রীস্বাধীনতা লইয়া আন্দোলন করিতেছেন। অধীন, দুর্ব্বল, অসহায় ভারতে স্ত্রীস্বাধীনতার সময় হইয়াছে কি না, তাহা আমরা এ প্রবন্ধে বিচার করিব না। যখন স্ত্রীস্বাধীনতার সময় হইবে, তখন তাঁহারা আপনারাই স্বাধীন হইবেন।

আমরা বলি মানসিক শক্তি যখন শিক্ষায় প্রস্ফুটিত হয়, তখনই মানব স্বাধীনতা লাভ করে। আমাদিগের স্ত্রীগণ যখন সেই প্রকার স্বাধীন হইবেন, তখন কাহারও অধিকার নাই, তাহাদিগের স্বাধীনতা অপহরণ করেন। সত্য বটে শতাব্দী হইতে শতাব্দী পর্য্যন্ত পুরুষের সেবা করিতে করিতে আমাদিগের দেশের রমণীগণের ভিন্ন অস্তিত্ব একেবারে লোপ পাইতেছে;—পুরুষের ইচ্ছার সহিতই রমণীর ইচ্ছা মিলিয়া যাইতেছে; কিন্তু যদি এদেশের মঙ্গল হয়, তবে নিশ্চয় এ ভাব তিরোহিত হইবে। ঈশ্বরের সৃষ্টির এই দুইটী আশ্চর্য্য পুষ্পকে যাঁহারা আপন পাশব বলে এক করিয়া রাখিয়াছেন কিম্বা রাখিতে যত্নবান, তাঁহাদিগকে আমরা সমাজের মহা অনিষ্টকারী বলিয়া জানি। পুরুষগণ ঈশ্বরের সৃষ্টির সৌন্দর্য্য বিনাশ করিয়া ভারতের মহা অনিষ্ট সাধন করিতেছেন। তাহাদিগকে আমরা কখনও ক্ষমা করিতে পারি না। তাঁহাদিগের দ্বারা যে অনিষ্ঠ সাধিত হইয়াছে, আমরা আর তাহার প্রশ্রয় দিতে পারি না। স্ত্রীপুরুষের উভয়ের সম-উন্নতি না হইলে কখনও সমাজ উন্নত হইতে পারে না। স্ত্রীগণের উন্নতির জন্য সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। যাহাতে ইহাঁদিগের মানসিক শক্তি সম্যক বিকশিত হয়, তাহার জন্যই অগ্রে চেষ্টা করা উচিত। মানসিক শক্তি উন্নত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা স্ত্রী-সাধীনতা প্রবর্ত্তিত দেখিতে বাসনা করি না; কারণ তাহার বিষময় ফল কল্পনা করিলেও আমাদের হৃদকম্প উপস্থিত হয়। মন সবল না হইলে তাঁহাদিগের আত্মরক্ষার উপায় নাই। তবে যাঁহারা মিলের

(John Stuart Mill) অনুসরণ করিতেছেন, তাহাদিগের কথা স্বতন্ত্র। উক্ত মহাত্মা বলিয়া গিয়াছেন 'সমাজ যত উন্নত হইবে সতীত্ব ও তত বিনষ্ট হইবে,' আমরা ক্ষুদ্রজীবী, একথার সারত্ব বুঝিতে পারি না। স্বভাব মন্দ হইলে কিপ্রকারে লোকের উন্নত অবস্থা স্বীকার করিতে হয়, জানি না। মনে করুন ব্যভিচার দোষে দেশ জর্জ্জরিত হইল, দ্বেষ, হিংসা, স্বার্থপরতা দ্বারা দেশ পরিপূর্ণ হইল, সে সমাজকে কি প্রকারে উন্নত বলিব? সে যাহা হউক, পূর্ব্বে আমাদিগের প্রদেশে যে প্রকার সমাজনীতি প্রচলিত ছিল, আমরা তাহা হইতে বিচ্যুত হইতে বাসনা করি না। আমরা অসভ্যই হই আর যাহাই হই; বিজাতীয় মন্দভাব অনুকরণ করিব কেন? মনের সুখ মনে। যে ব্যক্তি মনে সুখ না পায়, তাহার সুখ জগতে বিরল। অধুনা অনেকে দেশের প্রতি চটিয়া উঠিয়াছেন। পূর্ব্বের আচার ব্যবহার তাঁহাদিগের নিকট বড়ই ঘৃণার্হ; ইহার কারণ কি? তাঁহারা যে সুখ অন্বেষণে প্রবৃত্ত, তাহা কি স্বদেশের মধ্যে নাই?

আমাদিগের প্রধান দোষ এই আমরা ভাল বিষয় পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদাই মন্দ বিষয় অনুকরণে লিপ্ত থাকি। এ দোষ কিছুতেই দূর হইবে না! গবর্ণমেণ্টও আমাদিগকে বুদ্ধিহীন ভাবিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছেন,—ইচ্ছামত ঘুড়াইতেছেন, পদ তলে ফেলিয়া মর্দ্দন করিতেছেন; কিন্তু যে পথে আমাদিগের ভাবী উন্নতির আশা, ভরসা; সে পথে কণ্টক পুতিয়া রাখিয়াছেন; আমরা ইচ্ছা করিলে ও যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিতে সমর্থ হই না!! মনের আগুন মনেই জলিতেছে—চির দিন জ্বলিবে, তবে বৃথা অনুকরণ করিয়া দিন কাটাই কেন? মানব জীবনের উদ্দেশ্য দেশের উপকার। আমরা মানব, দেশের উপকারের জন্য দেহ ধারণ করিয়াছি। অতএব বৃথা অনুকরণ না করিয়া যাহাতে স্বদেশের উপকার করিতে পারি, তাহাতে বদ্ধ-পরিকর হইয়া চেষ্টা করা উচিত। আমাদের দুঃখ আছে—সুখ নাই; কষ্ট আছে—শান্তিনাই; অনুভূতি আছে—স্মৃতি নাই—থাকিলে "সে সাহস বীর্য্য নাহি আর্য্যভূমে, পূর্ব্ব গর্ব্ব সর্ব্ব খর্ব্ব হলো ক্রমে" এইরূপ সঙ্গীত শ্রবণেও মন সতেজ হয় না কেন? *

---

* এ প্রবন্ধে গ্রন্থকারের তিন বৎসর পূর্ব্বের মত লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

স্ত্রী-স্বাধীনতা।

স্বেচ্ছাচারী পুরুষের পাশব বল, স্বার্থপরতার বশবর্ত্তী হইয়া, বল সামর্থ্য-হীনা, মূক সহস্র সহস্র অবলার স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া স্ত্রীকুলের বুদ্ধি এবং প্রতিভা যদি মলিন করিয়া না রাখিত, তবে কেনা স্বীকার করিবেন, ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে রমণীর হৃদয়ের সৌন্দর্য্য, এই উত্তপ্ত সংসারে এক মাত্র শান্তি সলিল বলিয়া বোধ হইত ? চিরকাল এ সংসারে দেখিতে পাই,—রমণীর প্রতি পুরুষের কঠোর শাসন,—চিরকাল আমরা দেখিতে পাই—রমণীর প্রতি স্বেচ্ছাচারী পুরুষের পশুর ন্যায় ব্যবহার ! অনুন্নত বঙ্গ প্রদেশের অধিবাসী আমরা,—এ কথার সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে আর আমাদিগকে বিদেশীয় সমাজের ইতিহাসের পৃষ্ঠা উদ্ঘাটন করিতে হইবে না। রমণীর প্রতি পুরুষের এই প্রকার ব্যবহার, পৃথিবীর সর্ব্ব স্থানেই কেন এক সময়ে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে ? ইহার এক মাত্র কারণ,—পুরুষের শারীরিক বল রমণীগণের শারীরিক বল অপেক্ষা অধিক ;—এই পাশাব বলের আদর যতদিন থাকে, তত দিনই এই প্রকার ভাব সমাজে প্রচলিত থাকে। পৃথিবীর উন্নতির প্রথম সোপানে এই পাশব বলের রাজত্ব,—এই পাশব বলের আদর। 'জোর যার মুল্লুক তার' একথার আদর উন্নতির প্রথম অবস্থার লোকেরা স্বীকার করিয়া থাকেন। এই বলের অধিকারী মানবই বীর বলিয়া পৃথিবীতে ততদিন অভিহিত, যতদিন না জ্ঞানের আলো মানবের মনকে আলোকিত করিতে সমর্থ হয়। পাশব বলের পর,—জ্ঞানের রাজত্ব। যখন লোকমণ্ডলী এই জ্ঞানের আদর হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয়, তখনই তাহারা বলে,—কেবল পাশব বলে পৃথিবীর কার্য্য চলিতে পারে না,—জ্ঞান চাই। এই জ্ঞান অনুসন্ধানে যতদিন তাহারা নিযুক্ত থাকে, ততদিন তাহাদিগের মন কঠোর থাকে, এবং ততদিনও তাহারা রমণীর আদর বুঝিতে পারে না। এও উন্নতির চরম অবস্থা নহে। জ্ঞানের পর হৃদয়ের রাজ্য ;—এবং পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা এই উন্নতির সোপানই বাঞ্ছনীয়। এই হৃদয় রাজ্যে আসিয়া সকলেই পরস্পর প্রেমে আবদ্ধ হন, সকলেই সকলের নিকট বাধা পড়েন, আত্ম বিক্রয় পর্য্যন্ত করিতেও কুণ্ঠিত

হন না। এই বিশ্ব বিস্তৃত ভালবাসার রাজ্যই একতার রাজ্য; এই স্থানই মানবের প্রকৃত উন্নতির কল্যাণের পথ। এস্থানে আসিয়া পুরুষ রমণীর নিকট বশ্যতা স্বীকার করে। এস্থানে পুরুষের হৃদয়ের ভাব, রমণীর হৃদয়ের ভালবাসার নিকট জ্যোতিঃ বিহীন বলিয়া বোধ হয়। এই রাজ্যে আসিয়া লোক রমণীর প্রতি আর পশুভাবে ব্যবহার করিতে পারে না। এখানে আসিয়া আর রমণীর স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া আপনি প্রভুত্ব করিতে ইচ্ছান্বিত হয় না। বাস্তবিক এই পৃথিবীতে যতকাল পাশব বলের আদর, ততকাল রমণীর প্রতি অত্যাচার;—ততকাল রমণীর স্বাধীনতা অপহরণের ইচ্ছা। পাশব বল যখন মানবকে উত্তেজিত করিতে থাকে,তখন তাহার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না,—মঙ্গলামঙ্গল ধারণাশক্তি বিলোপ প্রাপ্ত হয়। এই পাশব বলের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া মানব যত কার্য্য সম্পন্ন করে, এক দিন প্রকৃত প্রস্তাবে সে জন্য তাহাকে আক্ষেপ করিতে হয়। এই পাশব বলের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া লোক বলে,—"স্ত্রীর আবার স্বাধীনতা!!—রমণী চিরকাল পুরুষের পদতলের কীট, তাহার আবার স্বাধীনতা!!" এ আশ্চর্য্য কথায়ই বটে। এ কথা পূর্ব্বে অসভ্য ইংলণ্ডবাসীরাও বলিয়া সুখ পাইত; কিন্তু আজ আর তাহাদের সে ভাব নাই। আজ পৃথিবীর মধ্যে সুসভ্য ইংরাজ রমণীর আদর করিতে শিখিয়াছেন। ইংলণ্ডের কেবল পাশব বলের সময় চলিয়া গিয়াছে তাহা নহে;—জ্ঞানের কঠোর ভাবের উপরে, হৃদয় রাজত্ব স্থাপন করিতেছে। অনেকে বলিয়া থাকেন, পুরুষ আবার স্ত্রী স্বাধীনতা প্রদান করিতে কে? ঈশ্বর স্ত্রীপুরুষ উভয়কেই স্বাধীন করিয়া সৃজন করিয়াছেন,—এরূপ স্থলে পুরুষ স্বাধীনতা প্রদান করিতে কে? স্বেচ্ছাচারী পুরুষ যদি স্ত্রীর স্বাধীনতা অপহরণ না করিত, তাহা হইলে আমরাও বলিতাম, পুরুষ স্বাধীনতা প্রদান করিতে কে? যখন পুরুষ স্বেচ্ছাচারের বশবর্ত্তী হইয়া রমণীর স্বাধীনতা অপহরণ করিয়াছে, তখন পুরুষ সেই স্বাধীনতা পুনঃ প্রদান না করিলে কখনও স্ত্রীজাতি স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে না। কল্পনার স্বপ্ন সকল সময়ে কার্য্যকর হয় না। প্রকৃত প্রস্তাবে পুরুষ, উদারতার দ্বারা ভূষিত হইয়া, যত দিন না স্ত্রীর অধিকার ও স্বাধীনতা বুঝাইয়া স্ত্রীর হস্তে অর্পণ করিবেন, তত দিন তাঁহারা স্বাধীন হইতে পারিবেন না। এ কথা যদি সত্য না হইত, তবে পুরুষ কঠোর অন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকিলেও রমণী পুরুষের বক্ষে পদাঘাত করিয়া স্বাধিকার লাভে সমর্থ হইতেন,—তবে আর

তাঁহারা, জীবন ধারণের জন্য, পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিণীর ন্যায় তৃষিত নয়নে অন্যের প্রতি চাহিয়া থাকিতেন না;—তবে আর তাঁহারা উঠিতে ও বসিতে এক মাত্র পুরুষের বাহু অবলম্বন করিবার প্রত্যাশায় প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন না। পুরুষ যে স্বাধীনতা অপহরণ করিয়াছে, পুরুষের উচিত সেই স্বাধীনতা পুনঃ অর্পণ করা। কিন্তু স্বেচ্ছাচারী পুরুষেরা বক্ষ স্ফীত করিয়া বলিতে একটু ও সঙ্কুচিত হন না,—রমণী চিরকাল পুরুষের পদতলে থাকিবার জন্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে!! সমাজ যতদিন এই প্রকার ঘৃণিত মত পরিপোষণ করিবে, তত দিন কখনও এদেশের মঙ্গল নাই। আমরা যথা ক্রমে স্ত্রী স্বাধীনতার বিরুদ্ধবাদীগণের মত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিব। স্ত্রীস্বাধীনতার বিরোধীগণ বলেন,—

১। স্ত্রীলোকদিগের শরীর দুর্ব্বল, তাহাদিগের দ্বারা স্বাধীনতার অপব্যবহারের আশঙ্কাই অধিক; কারণ শরীরের সহিত তাহাদিগের মন ও দুর্ব্বল হইয়া রহিয়াছে।

২। তাহারা উপযুক্ত শিক্ষা পায় নাই,—এরূপ স্থলে স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারে পরিণত হওয়ারই অধিক সম্ভাবনা।

৩। তাহারা এইক্ষণও অজ্ঞান অন্ধকারে বিচরণ করিতেছে; আর তাহাদিগের বুদ্ধি বা প্রতিভা কখনও যে পুরুষের জ্ঞানকে অতিক্রম করিতে পারিবে, তাহারও সম্ভাবনা নাই; সুতরাং শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের অধিকারী পুরুষের অধীনে থাকাই তাহাদিগের কর্ত্তব্য।

৪। এদেশে পুরুষগণ এইক্ষণ পর্য্যন্তও স্ত্রী-মর্য্যাদা শিক্ষা করে নাই; এ দেশের পুরুষদিগের কুটিলচক্রে তাহাদিগের সতীত্ব নষ্টের সম্ভাবনা অধিক।

৫। স্ত্রীস্বাধীনতায় বিজাতীয় অনুকরণ ভিন্ন আর উপকার নাই। অলক্ষ স্ত্রীর দ্বারা সংসারের কি উপকার হইতে পারে? কেবল সাহেবের অনুকরণ জন্য কে দেশের প্রচলিত প্রথা উল্লঙ্ঘন করিবে?

৬। আমরা দুর্ব্বল, পরাধীন। যখন আমরা আমাদের মান, সম্ভ্রম রক্ষা করিতে সমর্থ নহি, তখন আমাদের অপেক্ষা দুর্ব্বলা, সহায়-হীনা, আমাদের গৃহ লক্ষ্মীদিগকে স্বাধীনতা দিবার প্রস্তাব করা বাতুলতা মাত্র।

৭। আমাদের অধিকাংশই দরিদ্র, স্বাধীনতা দিতে হইলে টাকা চাই। নচেৎ ছ্যাকড়া গাড়িতে করিয়া স্ত্রীদিগকে সমাজের বাহির করিলে লাঞ্ছনার একশেষ।

৮। কেহ কেহ বলেন, আমাদিগের দেশে স্ত্রীস্বাধীনতা রহিয়াছে; দৃষ্টান্ত-স্থলে বলেন, স্ত্রীরা তীর্থ দর্শনে গমন করিয়া থাকেন;—আপন আপন অলঙ্কারাদি ইচ্ছামত ব্যবহার করেন;—গৃহ কার্য্যাদিতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা!! তাঁহারা পরাধীনা হইবেন কেন?

৯। কেহ কেহ বলেন, যদি স্ত্রীজাতি স্বাধীনতার অধিকারিনী হইবেন, তবে তাঁহারা এত কাল বিনা চেষ্টায় অধীনতা স্বীকার করিয়া আসিতেছেন কেন?

এই সকল আপত্তি আমরা যথাসাধ্য খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিব।

প্রথমতঃ। স্ত্রীলোকদিগের শরীর দুর্ব্বল, তাহা আমরাও স্বীকার করিয়া থাকি। বিদেশীয় রাজার শাসন যখন বর্ণভেদে রূপান্তর ধারণ করিয়া থাকে, তখন অন্ততঃ এইস্থলে একটু গুরুতর চিন্তার বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এই দুর্ব্বলতা কি করিলে দূর হইতে পারে? যাঁহারা কখনও স্ত্রীস্বাধীনতা দিতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহাদিগের কোন কথার প্রতি-উত্তর দিতে আমরা ইচ্ছা করি না;—কারণ তাঁহারা জাতীয় অভ্যুদয়ের প্রধান উপায় যাহা, তাহা অস্বীকার করেন। স্ত্রীলোকের শরীরের দুর্ব্বলতাই মানসিক দুর্ব্বলতার কারণ নহে। পুরুষের শরীরের বল অপেক্ষা স্ত্রীলোকের শরীর দুর্ব্বল হইতে পারে; কিন্তু মন দুর্ব্বল, একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। হিন্দু কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া, অন্ততঃ আমাদিগের দেশের স্ত্রীদিগের সতীত্ব রক্ষা করিবার সময় তাঁহারা যে প্রকার মানসিক বলের পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া, স্ত্রীলোকের মন দুর্ব্বল, এ কথা আমরা কখনও স্বীকার করিতে পারি না। অনেক স্থলে পুরুষের মনই বরং বিচলিত হইয়া থাকে; কিন্তু এ স্থলে স্ত্রীর মন অটল, সুদৃঢ়। তবে এই কথা যে সকল স্থলেই ঠিক থাকে, তাহা নহে। মানবের মন দুর্ব্বল, ইহাকে কখনও বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু সমাজে কঠোর অবরোধ প্রথা প্রচলিত থাকা সত্তেও, সে প্রকার দুর্ব্বলতার পরিচয় পাওয়া যায়। এস্থলে আর একটী কথা আমরা উল্লেখ না করিয়া পারি না। স্বাধীনতা না থাকিলে প্রকৃত প্রস্তাবে লোকের সবল মনের পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রলোভন হইতে দূরে রাখিলে তাহারা যে ভাল থাকিতে পারে, তাহা ঠিক কথা; কিন্তু যাঁহারা প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়া আত্মজয়ে সমর্থ, তাঁহারাই ধন্য, এবং তাঁহাদের মনই সবল। সেই প্রকার সবল মন, কখনও সম্মুখ সমর ব্যতীত, মনুষ্য উপার্জ্জন করিতে পারে না।

হিতাহিত জ্ঞান ও বিবেচনা শক্তি দ্বারা মানব যখন কুপথ পরিত্যাগ করে, তখনই তাহার মহত্ত্ব বিস্তৃত হয় ; নচেৎ কারাবদ্ধ,—প্রলোভন হইতে দূরগত-মানবের মন কখন ও সবল হইতে পারে না। শরীরের বল সম্বন্ধেও ঐ এক কথা। শরীর চালনা না করিলে যেমন, শরীর সবল হয় না, সেই প্রকার মানসিক শক্তি পরিচালিত না হইলেও মন সবল হয় না। আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকের শরীর যে এত দুর্ব্বল, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, তাহাদের শরীরের চালনা হয় না। এবং যাঁহারা স্ত্রীলোকের মনের দুর্ব্বলতা স্বীকার করেন, তাঁহারাও স্মরণ রাখিবেন, উপযুক্ত রূপে পরিচালিত না হইলে কখনও মন সবল হইতে পারে না। স্ত্রীলোকের মন যেমন ছিল, তেমনি রহিয়া গিয়াছে; কিন্তু আমরা সেই মূল ধরিয়াই বলিয়াছি,—স্ত্রীর মন পুরুষের মন অপেক্ষা দুর্ব্বল নহে। বাস্তবিক মহিলাদিগের মানসিক শক্তি সম্যক প্রকারে পরিচালিত হইবার বিস্তৃত স্থান পাইলে যে, তাঁহাদের মন আরো সবল হইবে, তাহাতে কোন প্রকার সন্দেহ নাই। অগ্রে স্বাধীনতা না পাইলে কখন ও তাহা সংসিদ্ধ হইতে পারে না। অধীন মন কখনও স্বেচ্ছামত বিচরণ করিতে পারে না : সুতরাং সম্যক সবলও হইতে পারে না। যাঁহারা বলেন,—অগ্রে সাঁতার শিখিব, তারপরে জলে নামিব, তাহাদিগের নিকট এ যুক্তি ঠিক যে—অগ্রে স্ত্রীর মন সবল হউক, তারপর স্বাধীনতা দিব !! জলে না নামিয়া যেমন সাঁতার শিক্ষা হয় না, সেই প্রকার স্বাধীনতার বিস্তৃত ক্ষেত্র ভিন্ন মন স্ফূর্ত্তি পায় না, সুতরাং সবল ও উন্নত হইতে পারে না। তাই বলিয়া আমরা বলি না, যে সাঁতার না জানে তাহাকে অসাধ সলিলে নিক্ষেপ কর !! তাই বলিয়া অমেরা বলি না,—স্ত্রীলোকের মন উন্নত করিতে হইবে, সুতরাং একেবারে বড় বড় সভায় লইয়া যাও। আমরা বলি যে জলে নামাইলে সাঁতার শিক্ষাও হয়, অথচ লোকের প্রাণ নাশের সম্ভাবনা নাই, প্রথমতঃ সেই জলে সাঁতার শিক্ষার্থীকে নামাও। আমরা বলি, যে স্বাধীনতায় স্ত্রীর প্রাণ বিয়োগের সম্ভাবনা নাই,অথচ শরীর সবল হইতে পারে,মন উন্নত হইতে পারে, সেই স্বাধীনতা দেও। আমরা শরীরের বলকে কোন প্রকার গণনায় আনিতে চাহি না। যাঁহার মন সবল, তাহার শরীর দুর্ব্বল হইলেও কোন আশঙ্কার বিষয় নহে। আমরা মানসিক বলেরই অধিক পক্ষপাতী। মানসিক বলে যাঁহার মন সতেজ হয়, আত্মা উন্নত হয়, তাঁহার শরীরের বল থাকুক বা না থাকুক, সে

লোকের পতন নাই। আবার সকল পুরুষের শরীরের বল সমান নহে, অথচ তাঁহারা সমানভাবে স্বাধীনতার অধিকারী ; তবে দুর্ব্বল স্ত্রীলোকের দ্বারা কেন স্বাধীনতার অপব্যবহার হইবে, আমরা এ আশঙ্কার অর্থ বুঝিতে পারি না।

দ্বিতীয়তঃ। শিক্ষা ভিন্ন কখনও মানসিক শক্তি বিকশিত হয় না, এবং মন সবল হয় না। এই শিক্ষা সকলেই পাইয়া থাকে, এবং একটু একটু করিয়া সকলের মনই উন্নত হয়। যাহারা ঘোরতর অসভ্য,—তাহারাও ক্রমে ক্রমে শিক্ষিত হয়। পুস্তক পাঠে শিক্ষার সহায়তা করে. কিন্তু পুস্তক ভিন্নও লোক শিক্ষিত হইয়া থাকে। লোক শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করুক বা না করুক, এই জগৎ সংসার তাহাকে শিক্ষা দিবেই দিবে। এই সাধারণ নিয়ম অনুসারে আমাদিগের দেশের রমণীগণও কিছু পরিমাণে শিক্ষিতা ; বোধ করি এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কিন্তু যতদূর হওয়া উচিত, তাহা হয় নাই। এ কথার কি উত্তর নাই ? এ কথার উত্তর এই,—পুরুষদিগের শিক্ষার জন্য যে সকল উপায় বিদ্যমান রহিয়াছে, স্ত্রীলোকের শিক্ষার জন্য তেমন কিছুই নাই। স্ত্রীশিক্ষার জন্য আমাদিগের দেশে কোন প্রকার চেষ্টা নাই। স্ত্রীশিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয়, আমাদিগের দেশে অপব্যয় মধ্যে পরিগণিত। তাহার কারণ এই,—আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকেরা চাকুরি প্রভৃতি জীবন ধারণের পথে গমন করেন না। আমরা বলি তাতেই বা ক্ষতি কি ? স্ত্রীলোকেরা জীবন ধারণের চেষ্টা করিবেন, তাহাতে কি ক্ষতি ? অন্যথা তাঁহারা এ চেষ্টা না করিলে, প্রকৃত প্রস্তাবে অনুৎপাদক পরিশ্রমের (অর্থাৎ তাহাদের শিক্ষা) জন্য অর্থ ব্যয় করা উচিত মনে করি না। আমরা বলি যাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে চাকুরি বা জীবন ধারণের উপায় অবলম্বন করিতে দিবেন না, তাঁহাদিগের স্ত্রীস্বাধীনতা বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু আমরা স্ত্রীস্বাধীনতাকে এত নীচ ভাবে দেখিয়া থাকি না। আমরা বলি, স্ত্রীশিক্ষার জন্য স্বাধীনতা চাই,—সে এই জন্য, এক দিকে যেমন তাঁহাদিগের মন উন্নত হইবে, সতেজ হইবে ; সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের দ্বারা সংসারের অনেক উপকার দর্শিবে। সংসার স্ত্রীপুরুষ উভয়ের নিকটেই অনেক প্রত্যাশা করিয়া থাকে। আমরা যে স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতার এত পক্ষপাতী, সে এই জন্য যে,—স্ত্রীলোকের দ্বারা বর্ত্তমান সময়ে কোন প্রকার দেশের উপকার হইতেছে না বলিয়া, দেশ এত হীনাবস্থাপন্ন রহিয়াছে। আমরা পুরুষদিগের

শিক্ষার জন্য যত উপায় দেখিতে পাইয়া থাকি, স্ত্রীলোকদিগের জন্য ও সেই প্রকার উপায় দেখিতে ইচ্ছা করি। কেবল কি তাহাই? না—আরও কিছু। প্রকৃত প্রস্তাবে দেখিতে গেলে,—প্রকৃত শিক্ষা ও স্বাধীনতা পাশাপাশী থাকে। শিক্ষা ও স্বাধীনতা অভিন্ন; ইহা প্রমাণ করিতে হইলে, এ দুইটীর সূত্র অগ্রে দেওয়া উচিত।

১। "যে প্রণালীর শিক্ষার দ্বারা মনের প্রত্যেক শক্তি চেষ্টার সহিত কার্য্যে রত হয়, তাহাকেই আমরা যথার্থ শিক্ষা বলি।

২। "প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের জ্ঞান এবং বিশ্বাস মতে যে অবস্থায় কার্য্য করিতে পারে, আমরা সেই অবস্থাকেই স্বাধীনতা বলি।

এই রূপ স্বাধীনতা ব্যতীত শিক্ষার অস্তিত্বও অসম্ভব; কারণ যাঁহাদিগের দ্বারা কোন জাতির স্বাধীনতা রত্ন অপহৃত হয়, তাঁহারা তাহার পুনরুদ্ধারের পথে এত কণ্টক রাখিয়া যান, যে কাহার সাধ্য সে পথে বিচরণ করেন। বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে, যথার্থ শিক্ষায় মন যতদূর স্বাধীন এবং স্বানুবর্ত্তী হয়, ততদূর আর কিছুর দ্বারাই হইতে পারে না; কারণ কেহই তাহার নিজকে না জানিয়া যথার্থ শিক্ষিত হইতে পারে না; মনুষ্য নিজকে জানিলেই স্বাধিকার এবং সাধারণ সম্বন্ধের বিষয় জানিলেন। এখন বলুন দেখি, কোন্ নীচাশয় নিজকে চিনিয়াও পরের পদে মস্তক বিলুণ্ঠিত করিতে কুণ্ঠিত না হয়? তবেই দেখা গেল যে শিক্ষা স্বাধীন ভাব উদ্দীপক"। *

প্রকৃত শিক্ষা যাহা তাহা স্বাধীনতা ব্যতীত হইতে পারে না। এবং স্বাধীনতার অস্তিত্বও শিক্ষা ব্যতীত অসম্ভব। অনেকে বলিবেন, আমাদিগের দেশ পরাধীন, কিন্তু এদেশেত শিক্ষা বিস্তৃত হইতেছে। একথার উত্তরে আমরা বলি,—এদেশে এখন ও প্রকৃত শিক্ষা বিস্তৃত হয় নাই। এদেশ প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষিত হইলে, এদেশ এত হীনাবস্থাপন্ন থাকিত না। যাঁহারা স্ত্রীলোকের শিক্ষা হয় নাই বলিয়া, ইহাঁদিগের স্বাধীনতা দিতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা স্মরণ রাখিবেন, স্বাধীনতা ব্যতীত প্রকৃত শিক্ষা হইতে পারে না। † দ্বিতীয়তঃ আমাদিগের পুরুষগণও প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষিত নহে, তাহাদিগের স্বাধীনতা যখন মঙ্গলের পথে লইয়া যাইতেছে, তখন স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা কেন মঙ্গলকর না

* ১২৮৩ সালের ভারত-সুহৃদ পত্রিকা ৪ র্থ সংখ্যা।

† ভরত-সুহৃদ—অভিন্ন ত্রয়।

হইবে? ঈশ্বরের সৃষ্টির এই দুই বিভাগের মধ্যে আমরা কোন প্রকার পার্থক্য দেখিতে পাই না, এস্থলে পুরুষ স্বাধীন, স্ত্রী পরাধীন; ইহাতে সমাজের এক বিভাগকে শিক্ষার অনধিকারিণী করিয়া আমাদিগের দেশের পুরুষগণ দেশের মহা অনিষ্ট সাধন করিতেছেন। বাস্তবিক স্ত্রীজাতি প্রকৃত শিক্ষিতা হইলে, ইহাঁদিগের দ্বারা যে সমাজের অশেষ প্রকার মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। এই শিক্ষার পথ ততদিন পর্য্যন্ত স্ত্রীদিগের নিকট অবরুদ্ধ থাকিবে, যত দিন না তাঁহাদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া হইবে।

তৃতীয়তঃ। স্ত্রীলোকেরা এইক্ষণ ও অজ্ঞান অন্ধকারে বিচরণ করিতেছেন,—সে কেবল পুরুষের নিষ্ঠুর ব্যবহারে। স্ত্রীলোকের বুদ্ধিবৃত্তি বা প্রতিভা পুরুষের বুদ্ধিবৃত্তি এবং প্রতিভা হইতে হীন, ইহা যাঁহারা বলিয়া থাকেন, তাঁহারা এ-কথার কোন প্রমাণ দিতে পারেন না। স্ত্রীলোকদিগের বুদ্ধি বা প্রতিভা পরিচালনের স্থান নাই বলিয়াই, আমরা তাঁহাদিগের বুদ্ধি বা প্রতিভার পরিচয় পাই না। ঈশ্বর সম উপকরণে স্ত্রী পুরুষ সৃজন করিয়া পুরুষকে মস্তিষ্কের অধিকারী করিয়াছেন, আর স্ত্রীকে মস্তিষ্ক শূন্য করিয়াছেন, আমরা একথা কখনও বিশ্বাস করি না। বস্তুতঃ যেখানে আমরা স্ত্রীলোকের বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনার উপায় দেখিতে পাই, সেই স্থানেই স্ত্রীলোকের বুদ্ধি ও প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়া থাকি। আমাদিগের দেশে স্ত্রীশিক্ষার তাদৃশ সুবিধা না থাকা সত্ত্বেও এদেশের যে সকল রমণী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তির কথা মনে হইলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। লীলাবতী, খনা প্রভৃতি বুদ্ধিবৃত্তির অলৌকিক পুত্তলিকা। আমেরিকা প্রদেশে স্ত্রীস্বাধীনতা প্রদত্ত হইয়াছে, সে দেশের পুরুষগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে, স্ত্রীজাতির বুদ্ধি বা প্রতিভা কখন ও পুরুষের বুদ্ধি বা প্রতিভা হইতে হীন নহে। ইংলণ্ডে যে সকল মহিলাগণ পৃথিবীর সকল সভ্য সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছেন, তাঁহাদিগের জীবন পর্য্যালোচনা করিলেও আমরা দেখিতে পাইব, স্ত্রীজাতির বুদ্ধি বা প্রতিভা পুরুষ অপেক্ষা হীন নহে। আমাদিগের প্রদেশে স্ত্রীজাতির বুদ্ধি চালনার সে প্রকার সুবিধা নাই বলিয়াই, আমরা স্ত্রীজাতির বুদ্ধি বা প্রতিভার পরিচয় পাই না। তাঁহাদিগের বুদ্ধি বা প্রতিভার পরিচয় পাই না বলিয়াই, আমরা তাঁহাদিগকে স্বাধীনতা দিতে চাই। যদি তাঁহাদিগের বুদ্ধি পুরুষের ন্যায় সমভাবে আজ পরিচালিত হইতে পারিত,তবে আমরা

যেরূপ তাহাদিগের স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া আর তাহা প্রদান করিতে চাহি না; তাহারাও সেই প্রকার আমাদিগের স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া আজ তাহা পুনঃ প্রদান করিত না। স্ত্রীজাতির শারীরিক ও মানসিক বল, বুদ্ধি এবং প্রতিভা সকলই আমরা মলিন ও প্রভাহীন করিয়া রাখিয়াছি; এবং রাখিতে সক্ষম হইয়াছি বলিয়াই আজ তাহাদিগের স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া রাখিতে সক্ষম হইতেছি; নচেৎ আমরা তাহাদিগের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলে অমনি তাহারাও আমাদিগের বিরুদ্ধে কথা বলিত; আমরা বলে বা কৌশলে স্ত্রী-স্বাধীনতা অপহরণ করিলে, তাহারাও বলে বা কৌশলে পুরুষ-স্বাধীনতা অপহরণ করিত! বাস্তবিক আমরাই তাহাদিগের সকল পথ বন্ধ করিয়াছি।

আর একটী কথা, মানিলাম আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোক এইক্ষণও পুরুষের ন্যায় জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে পারে নাই। কিন্তু বলত, আমরা ইংরাজের সম আসন লাভ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট সিবিলসর্ভিস প্রশ্ন লইয়া যে এত আন্দোলন করিতেছি, আমরা কি জ্ঞানে ইংরাজের সমকক্ষ হইতে পারিয়াছি? যাহাদিগের জ্ঞান আজ পৃথিবীর সকল জাতির উপরে বিজয় ধ্বজা তুলিয়াছে,—যাহাদিগের বিজ্ঞানের ভেরী আজ আকাশ ভেদ করিয়া উপরে উঠিতেছে,—রাজনীতির কৌশল পৃথিবীর সমস্ত রাজাকে সশঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে, আমরা কি তাহাদিগের সহিত জ্ঞানে তুলনীয় হইতে পারি? আমরা জ্ঞান গরিমায় তাহাদিগের সমান না হইয়াও তাহাদিগের ন্যায় রাজ্যের উচ্চ কার্য্য গ্রহণ করিবার জন্য, উচ্চ অধিকার লাভ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইতেছি। যদি কেহ বলেন যে, তোমরা জ্ঞানে হীন সুতরাং ইংরাজের ন্যায় উচ্চ কার্য্য পাইবে না, তবে কি তাহাদিগকে আমরা বাতুল বলিয়া উপেক্ষা করি না? কোন কোন পত্রিকা এ প্রকার কথা বলিতেছেন বলিয়া কি আমরা সেই সেই পত্রিকাকে পক্ষপাতী বলিতে সঙ্কুচিত হইয়াছি? বাস্তবিক ইংরাজ উচ্চ জ্ঞানের অধিকারী তাহা জানি; কিন্তু যে কার্য্য আমাদের দ্বারাও সম্পন্ন হইতে পারে, সে কার্য্যে অত জ্ঞানের ছলনা কি নিমিত্ত? হিতৈষি! আপনার প্রতি নিরীক্ষণ কর; ইংরাজের সহিত তুলনা করিয়া আমরা যে প্রকার অজ্ঞানী; আমাদের তুলনায় আমাদের স্ত্রী-সমাজ সেই প্রকার জ্ঞানহীন। কিন্তু তাহাতে কি? যেখানে অল্প জ্ঞানে কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে, সেখানে উচ্চ জ্ঞান দিয়া কি হইবে? আমরা যদি গবর্ণমেণ্টের নিকট

ইংরাজের সহিত সমান কার্য্য লাভ করিবার জন্য আবেদন করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদিগের দেশের স্ত্রীজাতিও আমাদিগের নিকট সম আসন লাভের জন্য প্রার্থনা করিতে পারেন। অধিকার সমান। তাহারা অনুদার—স্বেচ্ছাচারী,—বা পক্ষপাতী, যাহারা জ্ঞানের ছলনায় স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া রাখিতে ইচ্ছুক। আমরা যেমন গবর্ণমেণ্টকে বলিতেছি,—আমরা উচ্চ জ্ঞানের অধিকারী হই নাই তাতে কি, কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া পরীক্ষা কর, দেখ আমরা কার্য্য করিতে পারি কি না; আমাদিগের দেশের স্ত্রীজাতিও সেইরূপ বলিতে পারেন,—আমরা অজ্ঞান অন্ধকারে রহিয়াছি তাতে কি,—স্বাধীনতা দেও, পরীক্ষা করিয়া দেখ,—আমাদের বুদ্ধি ও জ্ঞান পুরুষের সমান হইতে পারে কি না। একথার প্রতিবাদ আমরা করিতে অক্ষম। যাঁহারা স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরোধী, তাঁহারা একথার উত্তর দিন, আমরা শুনিয়া কৃতার্থ হই।

চতুর্থতঃ।—ভারতের অবলাজাতির সতীত্ব জগতে প্রসিদ্ধ; অন্যান্য দেশে স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে যত অন্যায় কথা আরোপিত হইক না কেন, ভারতের ললনাগণের প্রতি কখনও আমাদিগের অবিশ্বাস হয় না। আমাদিগের দেশের পুরুষ জাতি এইক্ষণ পর্য্যন্তও স্ত্রীজাতির মর্য্যাদা করিতে শিক্ষা করে নাই, তাহা আমরা স্বীকার করি; কিন্তু স্ত্রীজাতির প্রতি আমাদিগের এত অল্প বিশ্বাস নহে যে, পুরুষের কুটিল মন এদেশের স্ত্রীজাতির সতীত্বের নিকট পরাস্ত হইতে পারে না। আমরা চিরকাল বলিয়া আসিয়াছি, এবং যতদিন পৃথিবীতে থাকিব ততদিন বলিব,—যে সতীর অস্তিত্বে সংসারের পুরুষ জাতির কোন প্রকার উপকার না হয়, সে সতীর অস্তিত্বে আবশ্যকতা নাই। অনেকে বলিয়া থাকেন,—গৃহে আবদ্ধ থাকে বলিয়া এদেশের রমণীগণ সতীত্ব রক্ষা করিতে সক্ষম, অন্যথা তাঁহাদিগের জীবন ঘোরতর দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইত। আমরা একথা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করি। প্রলোভন হইতে দূরে থাকিয়া যখন লোক আপনাকে পবিত্র রাখিতে সক্ষম হয়, তখন বাহিরে পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে না পারিলেও, তাহার অন্তরে পাপের চিত্র উদিত হইয়া তাহাকে অসার এবং অপদার্থ করিয়া থাকে। সহজ কথায় বলিতে হইলে আমরা এই বলিতে পারি,— প্রলোভন হইতে দূর স্থানে অবস্থান করিয়া যাঁহারা আত্মজয়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ হন,—বাহ্য জগত তাঁহাদিগের জীবনকে অসার জ্ঞান

না করিলেও, অন্তরদর্শী ঈশ্বরের নিকট তাহাদিগের আত্মরক্ষার উপায় নাই। আমাদিগের রমণীগণের মন এত সঙ্কুচিত, এত অসার ইহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। আমরা বলি—বলপূর্ব্বক একজনের সতীত্ব রক্ষা করার কোন নির্দ্দিষ্ট মান নাই। এই স্থানে আমাদিগের জনৈক বন্ধুর একটী গল্প মনে পড়িল। "একজন গৃহস্থ রাস্তার পার্শ্বে পরিবার লইয়া বাস করিতেন। সেই রাস্তা দিয়া প্রত্যহ এক জন পথিক সন্ধ্যার সময় গান করিতে করিতে চলিয়া যাইত। গৃহস্থ প্রত্যহ পথিকের গান শ্রবণ করিয়া চিন্তায় অস্থির হইতেন, ভাবিতেন,—স্ত্রীর সতীত্ব রক্ষা করা বোধ করি কষ্টকর হইয়া উঠিল। এক দিন তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না, সেই পথিককে ডাকিয়া বলিলেন,—দেখ, আমি এবাড়ীতে পরিবার লইয়া বাস করিতেছি, আর তুমি প্রত্যহ এই স্থান দিয়া গান করিতে করিতে যাও; ইহাতে স্ত্রীলোকের মন সহজেই পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, সুতরাং তুমি আর এ প্রকার করিও না।' পথিক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল,—আমার একটী কি দুইটী গান শুনিলেই যদি স্ত্রীলোকের মন চঞ্চল হয়,—তাহাদের সতীত্ব নষ্টের সম্ভাবনা হয়; তবে সে মন মনই নহে এবং এমন সতীত্ব না রাখিলেই কি চলে না?' পথিকের কথা শুনিয়া গৃহস্থ নীরব হইলেন।

আমরা জানি এসংসারে অনেক লোক আছেন, তাহারা আপন স্বভাবের কলঙ্করেখা রমণীর জীবনের সহিত অঙ্কিত করিয়া স্ত্রীকুলে ঘোরতর কলঙ্ক রেখা আরোপ করিয়া থাকেন। যাহারা যে প্রকার ধরণের লোক, তাহারা সে ভাবে সমস্ত জগৎ সংসারকে গ্রহণ করে, ইহা স্বাভাবিক। আমরা এমন অনেক লোকের সহিত আলাপ করিয়াছি, যাহারা বলেন এবং সন্দেহ করেন যে, 'এসংসারে ভাল লোক নাই, বা থাকিতে পারে না।' যাহাদিগের মন এত নীচ, তাহাদিগের প্রতি আমাদিগের কিছুই বক্তব্য নাই; তবে আমরা এই পর্য্যন্ত বিশ্বাস করি,—স্ত্রীজাতির হৃদয়ের বল ভিন্ন,—জীবনের আদর্শ ভিন্ন, তাহাদিগের সে কুসংস্কারাবৃত মনের সেই দূষিত চিত্র কোন প্রকার তর্ক বা কথায় দূর হইবে না। লোকের মন সকল সময়ে কেবল কথায় পরিবর্ত্তিত হয় না। অনেক সময় দেখিতে পাইয়া থাকি, যেখানে কথা কোন প্রকার কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে না, সেখানে 'প্রত্যক্ষ ঘটনা'য় অনেক কার্য্য এবং সুফল প্রসব করিয়া থাকে। দৃষ্টান্তে মানব হৃদয়ে যে সুফল অঙ্কিত করে, এমন আর

কিছুতেই পারে না। এই প্রকার নীচ প্রবৃত্তির লোকদিগকে সেই প্রকার উচ্চ জীবনের দৃষ্টান্ত ভিন্ন আর কেহই পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না।

আমাদিগের পুরুষ যে স্ত্রীজাতির মর্য্যাদা করিতে শিক্ষা করে নাই, তাহা ঠিক কথা। কিন্তু স্কুলে না পড়িয়া কে কবে শিক্ষা করিতে পারিয়াছে? এ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুলের কথা বলিতেছি না। এই সংসার স্কুলে পুরুষ যেমন পুরুষের মর্য্যাদা করিতে পারে, পুরুষ সে প্রকার স্ত্রীর মর্য্যাদা জানে না, ইহার একমাত্র কারণ এই,—স্ত্রীজাতিকে স্কুলে স্থান দেওয়া হয় না। সমাজে উভয় জাতি মিলিত না হইলে, কখনও উভয়ের প্রতি উভয়ের সম্মান ও মর্য্যাদা লাভ হইতে পারে না। অনেকে বলিয়া থাকেন, সে প্রকার মিলনে সুফলের পরিবর্ত্তে কুফল ফলিয়া থাকে। আমরা তাহা বিশ্বাস করি না। যখন কোন ইংরাজমহিলা রাস্তাদিয়া চলিয়া যান, তখন তাঁহার প্রতি কাহারও কুটিল নয়নের বক্রগতি পতিত হয় না; কিন্তু সেই সময়েই একটী এদেশীয় ভদ্রমহিলাকে রাস্তায় দেখিলে অমনি চতুর্দ্দিকের কুটিল নয়ন সেই দিকে আকৃষ্ট হয়! দেশের কি শোচনীয় অবস্থা !! কিন্তু আমরা বলি যখন এই প্রকার চিত্র আর নূতন বোধ হইবে না, অর্থাৎ যখন পুরুষের ন্যায় দলে দলে এদেশের মহিলাগণ রাস্তায় বাহির হইবেন, তখন আর তাহাদিগের নয়নের এ কুটিল ভাব থাকিবে না। আমরা স্বীয় জীবনের প্রত্যক্ষ পরীক্ষার দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, স্ত্রীজাতির সহিত পুরুষজাতি সম্মিলিত না হইলে, উভয়ের প্রতি উভয়ের সম্মান বা মর্য্যাদা বৃদ্ধি হইবে না। আমাদিগের দেশের লোক, স্ত্রীজাতির সহিত মিলিত না হইলে, কখনও কেবল কল্পনা করিয়া স্ত্রীজাতির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিবে না।

আর একটী কথা। আমরা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি, কেবল বিশ্বাস করি না, পরীক্ষা দ্বারা বুঝিয়াছি,—আমাদিগের দেশের পুরুষের মন অপেক্ষা তুলনায় স্ত্রীজাতির মন অত্যন্ত সবল। যদি এ দেশের নৃশংস পশু সকলের কুটিল নয়ন ভাল হয়,—তবে তাহা রমণী জীবনের উচ্চ আদর্শে হইবে। আমরা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিয়া থাকি, যদি এদেশের পাষণ্ডদল কখন দলিত হয়,—তবে তাহা আদর্শ সতীদিগের দ্বারায় হইবে। আমাদিগের দেশে সে প্রকার সতীত্ব চাই না,—যাহা কেবল বল পূর্ব্বক রক্ষা করিতে হয়। আমাদিগের দেশে রমণীর সে দুর্ব্বল মন চাই না,—যাহা প্রলোভন দেখিলেই চঞ্চল হইয়া

উঠে। পুরুষের মন, পাপের অগাধ সলিলে আপন অস্তিত্ব ডুবাইয়া রমণী জীবনে ইহাপেক্ষা আর অধিক কি শোচনীয় অবস্থা কল্পনা করিবে!! যদি এদেশে প্রকৃত হৃদয়বান, পবিত্র, পাপের অস্পৃশ্য আত্মজয়ী কোন মানব থাকেন, তবে অবশ্য তিনি স্বীকার করিবেন, এদেশের স্ত্রীর সতীত্ব অতুলনীয়; তাহা সহস্র সহস্র পুরুষের কুটিল মনকে পরাজিত করিয়া আপনাকে জয়ী করিতে পারে। বাস্তবিক স্ত্রীজাতির সহিত সম্মিলিত না হইলে এদেশের পাষণ্ডকুল কখনও দলিত হইবে না,—এদেশের লোক কখনও স্ত্রীজাতির মর্য্যাদা শিখিবে না। ঈশ্বর এদেশের অবলাগণের একমাত্র সহায় হইয়া তাঁহাদিগের হৃদয়ের বল শত গুণে বর্দ্ধিত করুন।

পঞ্চমতঃ।—স্ত্রী পুরুষ উভয়কে আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টির এক আশ্চর্য্য রচনা বলিয়া জানি। ঈশ্বর সংসারে কোন পদার্থকেই অকর্ম্মণ্য ও উদ্দেশ্য শূন্য করেন নাই, ইহা আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস। স্ত্রী পুরুষ উভয়ের জীবনই উদ্দেশ্য পূর্ণ এবং কর্ম্মশীল। ঈশ্বর এই দুই ভিন্ন প্রকৃতি মিলিত করিয়া পূর্ণ মানবের ছবি জগতে দেখাইয়াছেন। আমরাও যখন মানবতত্ত্ব অনু-সন্ধানে প্রবৃত্ত হই,—তখন রমণীর মধ্যে এমন কতকগুলি ভাব জাজ্বল্যমান দেখিতে পাই, যাহা পুরুষের মধ্যে একেবারেই নাই; আবার অন্যদিকে পুরুষের মধ্যেও এমন কতকগুলি ভাব আছে, তাহা স্ত্রীর মধ্যে আদৌ পরি-লক্ষিত হয় না, একথা বোধ করি সকলেরই স্বীকার্য্য। এই সকল যখন তন্ন তন্ন করিয়া দেখি, তখন স্ত্রী পুরুষ উভয়কে ভিন্ন ভিন্ন রূপে আমরা প্রকৃতির অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়া মনে করিয়া থাকি। এই দুই অর্দ্ধ অঙ্গ মিলিয়া যখন পূর্ণাঙ্গ মান-বের ছবি সৃজিত করে, তখন সে চিত্র, সে মনোহারিত্ব দেখিয়া আমরা বিস্ময়াপন্ন হই, এবং স্রষ্টার অত্যাশ্চর্য্য লীলা সাগরে ডুবিয়া যাই। স্ত্রী পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন রূপে সংসারের সকল কর্ত্তব্য পালন করিতে সক্ষম নহেন; তজ্জন্যই ঈশ্বরের রাজ্যে এমন একটী বন্ধনী আছে, যাহাতে এই দুই জনকে অকাট্য বন্ধনে সম্বন্ধ করে। নিতান্ত অসভ্যদিগের মধ্যেও এ বন্ধনের অস্তিত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে;—ইহা লোকের সৃজিত বন্ধন নহে; ইহা ঈশ্বর প্রদত্ত বন্ধন। এই বন্ধনকে আমরা প্রেম বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকি। এই প্রেমে যখন অর্দ্ধাঙ্গ স্ত্রী ও অর্দ্ধাঙ্গ পুরুষকে মিলিত করিয়া পূর্ণ মানব সৃজন করে, তখন তাহাকে বিবাহ বলিয়া থাকি। ঈশ্বর এই উভয়কে তুল্য স্বাধীনতা প্রদান

করিয়াছেন, ইহার মধ্যে কাহাকেও প্রভু এবং কাহাকেও দাসী করেন নাই। স্ত্রী স্বাধীনতায় বিজাতীয় অনুকরণ হয়, একথা আমরা অলীক, মূল শূন্য বলিয়া স্বীকার করি ;—এ ঈশ্বরের অনুকরণ, এ ঈশ্বরের প্রদত্ত ধন। মানব দস্যু বৃত্তি করে, কত পাপ কার্য্য করে, কিন্তু তাহা মানবের স্বাভাবিক আত্মার কার্য্য নহে। সেই প্রকার পুরুষ স্বেচ্ছাচারিতার দ্বারা বলপূর্ব্বক স্ত্রী স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া থাকে, ইহাও স্বাভাবিক নহে। স্ত্রীজাতিকে আমরাই অলস করিয়া তুলিয়াছি,—আপনারা প্রভু হইয়া বৈদিক সময়ের ব্রাহ্মণের ন্যায়, স্ত্রীদিগকে অলস, অকর্ম্মণ্য, সকল কার্য্যের অনুপযুক্ত করিয়া তুলিয়াছি। ব্রাহ্মণেরা যেমন শূদ্রদিগের বেদ পাঠ নিষিদ্ধ বলিয়া দিয়াছিলেন, আমরাও সেই প্রকার অবলাদিগের বিদ্যা শিক্ষা অবৈধ বলিয়া দিয়াছি। ব্রাহ্মণেরা যেমন শূদ্রদিগকে সকল কার্য্যেরই অনধিকারী প্রতিপন্ন করিয়া আপনারা প্রভুর স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, আমরাও সেই প্রকার স্ত্রীদিগকে সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া আপনারা প্রভু হইয়াছি। কাল সহকারে ব্রাহ্মণের ক্ষমতা বিলুপ্ত হইতেছে ; কিন্তু এদেশের অবলা-দলন পাষণ্ডদিগের ক্ষমতা কি দলিত হইবে না ?

আর একটী কথা,—স্ত্রী-স্বাধীনতাকে যাঁহারা সাহেবের অনুকরণ বলিয়া দেশের প্রথা উল্লঙ্ঘন করাকে দোষের বলিয়া থাকেন, তাঁহারা স্মরণ রাখিবেন, অনুকরণই মানব জীবনের শিক্ষা পথের নেতা এবং উন্নতির মূল। নিতান্ত অসহায় অবস্থা হইতে বালক অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অনুকরণ করিয়া থাকে। এই অনুকরণ ভিন্ন মানব উন্নতি লাভে অসমর্থ। কিন্তু অনুকরণের আবার সীমা আছে। যাহার অনুকরণ ধারণ করিবার শক্তি নাই, তাহার অনুকরণ না করাই ভাল ; কারণ বল শূন্য, শক্তি শূন্য অনুকরণ প্রিয় ব্যক্তি ভাল বিষয় অনুকরণ করিতে যাইয়া মন্দ বিষয় অনুকরণ করিয়া ফেলে। অনুকরণ করা দোষের নহে, কিন্তু মন্দ বিষয় অনুকরণ করা দোষের। যাঁহারা মন্দ পরিত্যাগ করিয়া ভাল টুক অনুকরণ করিতে পারেন, এ সংসারে তাহারাই ধন্য। স্ত্রী স্বাধীনতাকে বলপূর্ব্বক আমরা অপহরণ করিয়াছি, এইক্ষণ বিদেশীয় অনুকরণেও যদি আমরা ইহা পুনঃ প্রদান করিতে পারি, তাহাতে আমাদের গৌরব ভিন্ন অগৌরব নাই।

ষষ্ঠতঃ। আমরা ক্রমাগত দেখিয়া আসিতেছি, আমেরিকার দাস প্রথার

পক্ষপাতীগণ যে সকল আপত্তি করিয়া দাসদিগের স্বাধীনতা প্রদান করিতে অস্বীকার করিতেন, আমাদিগের দেশের পুরুষগণ ঠিক সেই সকল আপত্তি তুলিয়া স্ত্রী-স্বাধীনতা দিতে অস্বীকার করেন। চ্যানিং, পারকার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের পুস্তকে ঠিক যেন আমাদিগের স্ত্রী স্বাধীনতার বিরোধী-দিগের আপত্তিগুলি রহিয়াছে। আমেরিকার দাস ব্যবসায়ের পক্ষপাতীরা বলিতেন,—দাসেরা দুর্ব্বল, অশিক্ষিত, আজন্ম দাসত্ব করিয়া আসিয়াছে, সহায়-হীন, মন দুর্ব্বল, ইহারা কি স্বাধীনতার সৎব্যবহার করিতে পারে? আমা-দিগের দেশের লোকেরাও বলেন,—স্ত্রীজাতি দুর্ব্বল, অসহায়, পরাধীন, চির-কাল গৃহ পিঞ্জরায় আবদ্ধ রহিয়াছে,—ইহারা কি স্বাধীনতার সৎব্যবহার করিতে পারে? পারে ত না—ই; যাঁহারা ইহার প্রস্তাব করেন, তাঁহারা বাতুল।* অবলাকুলের এই প্রকার হিতৈষীদিগকে আমরা বলিতে চাই,—ঈশ্বর অবলাদিগকে যে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন, সেই স্বাধীনতা অপ-হরণ করিতে তোমাদের কি অধিকার? ঈশ্বর প্রত্যেক মানবকে বুদ্ধি, প্রতিভা, বিবেচনা শক্তি প্রদান করিয়া সৃজন করিয়াছেন; ইহাদিগের আপনাদিগের মঙ্গলামঙ্গলের ভার প্রত্যেকের নিজ হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন; তিনি এক জনকে প্রভু এবং এক জনকে দাস করেন নাই। যাহাদের শরীর দুর্ব্বল, তাহাদের মন সবল, আমরা একদিকে না একদিকে প্রত্যেকের মহত্ব দেখিতে পাইয়া থাকি। বঙ্গপ্রদেশের পুরুষ আমরা যে পরস্পর মান সম্ভ্রম রক্ষা করিতে সমর্থ হই না, তাহার এক মাত্র কারণ, আমরা অন্যের বাহু অবলম্বন করিয়া থাকিতে ভালবাসি। অন্যের তোষামোদ আমাদিগের জীবনের ভূষণ; ইংরাজ-দিগের ভালবাসা পাইবার জন্য আমরা এত লালায়িত যে, তাহাদের পদধূলি মস্তকে বহন করিতেও কাতর বা কুণ্ঠিত হই না। বাস্তবিক যাহাদের মনে বল আছে, তাহাদের শরীরে বল না থাকিলেও মান সম্ভ্রম রক্ষার পক্ষে কষ্ট নাই। মানসিক বল এবং হৃদয়ের বলকে আমরা পাশব বল হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ মনে করি। এই প্রকার মানসিক বল এবং হৃদয়ের বলের নিকট পৃথিবী মস্তক অবনত করিয়া থাকে। একথা যদি সত্য না হয়, তবে এজগতে আর কিছু সত্য আছে কি না, তাহাতেও সন্দেহ আছে। অবলাজাতির হৃদয়ের বল অত্যন্ত প্রবল, সুতরাং মনের বলও অল্প শিক্ষা ও জ্ঞান উপার্জ্জনে বর্দ্ধিত

* ১২৮৬ সালের ২৩ ভাদ্রের সাধারণী (প্রাপ্ত প্রবন্ধ)।

হইতে পারে। তাঁহাদিগের মান সম্ভ্রম আমাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে কেন? তাঁহাদিগের মান, মর্য্যাদা তাঁহারা আপনারাই রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন।

সপ্তমতঃ। এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা বলেন আমরা দরিদ্র, সুতরাং আমাদিগের স্ত্রীদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত নহে।* স্বাধীনতা ব্যতীত শিক্ষা হয় না, ধর্ম্ম হয় না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। এবং স্বাধীনতা যদি অবলাকুলের উপকারজনক পদার্থ হয়, তবে দরিদ্রতার ছলনায় সেই কল্যানের পথে বিচরণ করিতে না দেওয়া কোন্ প্রকার যুক্তি শাস্ত্রের তর্ক, আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। যাহারা ধনীদিগকে এবং নির্ধনদিগকে ঈশ্বরের সৃষ্টির দুই ভিন্ন বিভাগ বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহাদিগকে আমরা বাতুল বলিয়া উপেক্ষা করি বা না করি সে এক কথা; কিন্তু তাহারা যে কখনও নীতি ও সত্যের আদর জানেন না, ইহা ঠিক কথা। আমরা বলি ধর্ম্মনীতি যেমন ধনী ও নির্ধন উভয়ের সঞ্চয়ের ধন, সেই প্রকার স্বাধীনতাও যদি প্রকৃত প্রস্তাবে কল্যাণকর হয়, তবে ইহাও ধনী ও নির্ধনের হৃদয়ের ভূষণ। স্বাধীনতাকে যাঁহারা অর্থের সহায়তার উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াসী হন, তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীনতার আদর করিতে জানেন না। স্বাধীনতায় গাড়ি চাই না, ঘোড়া চাই না,—দ্বিতল অট্টালিকা চাই না,—কিছুই চাই না। যে মনুষ্য, যে হৃদয়ের অধিকারী,—মনের অস্তিত্ব যাহাতে আছে;—বিবেচনা শক্তি ও বিবেক যাহার আত্মাকে সজীব রাখিয়াছে,—সেই স্বাধীনতার অধিকারী। আমরা বলি অর্থ থাকুক বা না থাকুক,—স্বাধীন সে, যে আপনাকে আপনি চিনিতে পারিয়া আপনার সম্বন্ধকে সমাজের সহিত মিলাইতে পারিয়াছে। বাস্তবিক যাঁহারা স্বাধীনতাকে কেবল ধনীদিগের সম্পত্তি বলিয়া স্বীকার করেন, তাহাদের ন্যায় নীচ প্রকৃতির লোক এই ভূমণ্ডলে নাই। আমরা বলি অনেক পুরুষ আছে,—যাহারা দরিদ্র,—অর্থ নাই—টাকা নাই, গাড়ি ঘোড়া নাই, কিন্তু তাহাদের স্বাধীনতা কোন্ বড় লোক অপহরণ করিতে সক্ষম? এই যে দীন দরিদ্র, মলিনভাবে স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে এই মলিন কাহিনী লিখিতে বসিয়াছে,—ইহার অর্থ নাই,—টাকা নাই—গাড়ী ঘোড়া নাই,—কিন্তু সংসারের কোন্ ক্ষমতাশালী লোক ইহার স্বাধীনতা অপহরণ করিতে পারে? স্বাধীনতা

* আলবার্ট হল,—প্রতাব বাবুর বক্তৃতা।

মনে, ইহা বাহিরের বস্তু নহে, ইহা আপন আসনে আপনি প্রতিষ্ঠিত ;—বাহিরের কোন পদার্থ ইহার অবলম্বন নহে। সংসারে যাহার মন স্বাধীনতায় উজ্জ্বল হয়, কোন প্রকার বাধা বিপত্তি সে মনের স্বাধীনতা অপহরণ করিতে পারে না।

অষ্টমতঃ। অনেকে বলিয়া থাকেন, আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতা আছে ;—তাহারা ঘরে কেমন বিচরণ করে, কেমন গৃহে কর্ত্তৃত্ব করে, কেমন তীর্থ স্থানে গমন করে, কেমন পুকুরে স্নান করিতে যায়।* এই যুক্তির কথা শুনিয়া আমরা হাসি সম্বরণ করিতে পারি না। আমাদিগের দেশের মহিলাগণের এই প্রকার স্বাধীনতার কথা শুনিলে আমাদের একটী গল্প স্মরণ হয়। একটী গৃহস্থ একটী পাখী পুষিত ;—পাখিটী পিঞ্জরায় আবদ্ধ থাকিত ; কিন্তু পিঞ্জরায় থাকিয়াও খাবার খাইত, এদিক ওদিক যাইত ও বুলি বলিত। গৃহস্থ প্রত্যহ সকলের নিকট বলিতেন ;—দেখত আমার পাখিটী কেমন স্বাধীন, পাখী কেমন স্বাধীনভাবে আহার করে! পাখী স্বাধীনভাবে কেমন পিঞ্জরার এদিক ওদিক যায়! পাখী স্বাধীনভাবে কেমন গান করে!! আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকেরাও সেই প্রকার স্বাধীন! তাঁহারা কেমন আহার করেন! স্বাধীনভাবে কেমন পরিচ্ছদ পরিধান করেন! স্বাধীনভাবে কেমন কথা কহেন!! আমাদিগের দেশের লোকের মন এত নীচ যে, স্ত্রীলোকদিগের গৃহ পিঞ্জরার বিবরণ প্রভৃতিও স্বাধীনতা বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে!!

নবমতঃ। স্ত্রী-জাতি কখনও অধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে চেষ্টা করে নাই, একথা আমরা বিশ্বাস করি না। ঝান্সির রাণী প্রভৃতি রমণী স্বাধীনতার জন্য জীবন দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। ফ্রান্স স্ত্রী-বীর্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ ;—সেদেশের রমণীগণ স্বাধীনতার জন্য বিষম সমরে প্রবেশ করিতেও কাতর হয় নাই। আমেরিকার রমণীগণ এত স্বাধীনতা প্রিয় যে, আর তাঁহাদিগের স্বাধীনতা অপহরণ করিবার কাহারও শক্তি নাই। বঙ্গবাসী পুরুষগণ শত শত বৎসর দাসত্ব স্বীকার করিয়াও যে কারণে স্বাধীনতা পাইবার জন্য চেষ্টা করে নাই, সেই কারণের আধিক্য হেতু এদেশের রমণীগণ অধীনতার বিরুদ্ধে চিৎকার করিতেছে

* সাধারণী ১৬ই ভাদ্র ১২৮৬।

না, কিম্বা করে নাই। কিন্তু আমাদিগের দেশের পুরুষগণের স্বাধীনতা নাই, এবং সে স্বাধীনতা পুনঃ লাভের জন্য চেষ্টা করে না বলিয়া কি তাহারা স্বাধীনতার অনধিকারী? আমাদিগের দেশের রমণীগণ তবে কেন অনধিকারিনী হইবেন? দাসেরা স্বাধীনতার আস্বাদন বুঝিত না বলিয়া তাহারা তৎবিরুদ্ধে চেষ্টা করে নাই; কিন্তু এইক্ষণ কি তাহারা স্বাধীনতা পাইয়া তাহার সুখ-ভোগে বঞ্চিত হইতেছে? নীতিবাদীগণের এ যুক্তি যুক্তিই নহে যে, স্ত্রীলোকেরা এতকাল স্বাধীনতা পাইবার জন্য চেষ্টা করেন নাই বলিয়া, তাঁহারা স্বাধীনতার অনধিকারিনী!

বাস্তবিক দেখিতে গেলে, স্ত্রী-স্বাধীনতা অপহরণ করিবার আমাদিগের কোন অধিকার বা যুক্তি নাই। ঈশ্বরের প্রদত্ত স্ত্রী-স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া একদিকে আমরা অন্যায় ও অবৈধ কার্য্য করিয়াছি, অন্য দিকে আমরা পাশব বলের পরিচালনার জন্য, এই যুক্তি বিরুদ্ধ স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বার্থপরতার উদাহরণ দেখাইয়াছি। যাহা করিয়াছি সে জন্য অনুতাপ ভিন্ন আর কিছুই করিবার নাই; ভবিষ্যতে আর আমরা স্বাধীনতা অপহরণ না করি, তজ্জন্য চেষ্টা করা উচিত। আমরা যখন স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা অপহরণ করিয়াছি, তখন আমরা স্বাধীনতা পুনঃ প্রদান না করিলে আর তাঁহারা স্বাধীনতা পাইতে পারেন না। আমাদিগের উচিত এইক্ষণ স্বাধীনতা প্রদান করা। যদি তাহা না করি তবে নিশ্চয়, কালক্রমে যখন তাঁহাদের চক্ষু প্রস্ফুটিত হইবে, তখন আর তাঁহারা আমাদিগের মুখাপেক্ষিনী হইয়া থাকিবেন না। কিন্তু স্বাধীনতা প্রদান করিব কি কেবল বিলাসের সেবা করিতে? কেবল আলাপ পরিচয়, সামাজিক সম্মিলন, নৈতিক ব্যবহার, পথে বিচরণ প্রভৃতিতে স্বাধীনতা দিবার সময়ে আমাদিগের একটী বিষয় চিন্তা করা উচিত। সকল প্রকার স্বাধীনতা প্রদান করিলেও যদি স্ত্রীজাতি আপন আপন জীবন ধারণের উপায় সংস্থান করিতে না পারেন, তবে নিশ্চয় তাঁহাদিগকে পুরুষের মুখাপেক্ষিনী হইয়া থাকিতে হইবে। স্ত্রীজাতি জীবন ধারণ বিষয়ে পুরুষের মুখ চাহিয়া থাকিতে বাধ্য হন বলিয়া তাঁহাদিগের জীবন এত পরাধীন। বাস্তবিক কোন প্রকার স্বাধীনতা প্রদান করিবার পূর্ব্বে, স্বাধীন ভাবে তাহাদিগের জীবন ধারণের পথ পরিষ্কার করা বিধেয়। নচেৎ কেবল বিলাসের জন্য স্বাধীনতা, সামাজিক

সম্মিলনের জন্য স্বাধীনতা, ইহা আমরা চাই না। স্ত্রীস্বাধীনতা না থাকাতে সংসারের অনেক প্রকার অপকার হইতেছে, সে এই জন্য যে,—মানব জাতির এক শ্রেণীর পরিশ্রম কেবল অন্য শ্রেণীর জীবন ধারণে ব্যয়িত হইয়া যাইতেছে;—তাহাদিগের জীবন দ্বারা সংসারের কোন প্রকার উপকার দর্শিতেছে না। অনুৎপাদক পরিশ্রমের জন্য মূলধন ব্যয় করা যে প্রকার অনুচিত, সেই প্রকার এক শ্রেণীকে অকর্ম্মন্য করিয়া রাখিবার জন্য অন্যশ্রেণীর পরিশ্রম ব্যয়িত হওয়া অনুচিত। স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকার, সংসারের প্রত্যেক বিষয়ের জন্য উভয়েই দায়ী। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যেরূপ পবিত্র পদার্থ, সেরূপ আর কিছুই নহে। আমাদিগের দেশের প্রধান অভাব এই,—পুরুষজাতি কর্ম্ম করে, স্ত্রীজাতি আলস্য পরায়ণা হইয়া বাস করে; পুরুষও স্বেচ্ছাচারী হইয়া, আপন ক্ষমতায় তাহাদিগকে পদতলে রাখিয়া কৃতার্থ হয়। আমাদিগের দেশের যে সকল মহিলাগণ উপযুক্ত শিক্ষা পাইতেছেন, তাঁহারা পুরুষের ন্যায় সমান অধিকার লাভ করিয়া সকল বিভাগকে উজ্জ্বল করুন, আপন আপন জীবন ধারণের সংস্থানে চেষ্টিত হউন, জ্ঞান বুদ্ধিতে পুরুষকে অতিক্রম করিতে চেষ্টা করুন। তাহা হইলে দেশের মহৎ অভাব দূর হইবে; স্বেচ্ছাচারী পুরুষের ক্ষমতা হতবল হইবে, এবং রমণীকুল ঈশ্বর প্রদত্ত স্বাধীনতা লাভের উৎকৃষ্ট পথ পাইয়া সেই পথেই অগ্রসর হইবে। যাঁহারা এইক্ষণ পথ প্রদর্শিকা হইবেন, তাঁহাদিগকে অনেক বিষয় ভাবিতে হইবে। অনেকদিক রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। দেশ তাহাদিগের নিকট পরীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে; তাঁহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইলে, দেশের পথ পরিষ্কৃত হইবে। আর দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাদের পদ যদি দৈব দুর্ব্বিপাকে স্খলিত হয়, কিম্বা আসন স্থান ভ্রষ্ট হয়, এদেশের স্ত্রী-কুলের ইতিহাস ঘোরতর কালিমা দ্বারা অঙ্কিত হইবে। স্বত্ব লাভ করা সহজ কথা,—কিন্তু সেই স্বত্বের উপযুক্ত ব্যবহার অত্যন্ত কঠিন। যে সকল ভগ্নিগণ এইক্ষণ প্রস্তুত হইয়া অগ্রসর হইবার পথে দণ্ডায়মান হইতেছেন, তাঁহাদিগকে আমরা এই বলিতে চাই,—দেশের প্রধান অভাব তাঁহাদিগের দ্বারা দূর হইবে, এই আশা করিয়া আমরা তাঁহাদিগকে পথ প্রদর্শন করিতেছি; নির্ভয় অন্তরে, একমাত্র ধর্ম্ম ও নীতিকে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হউন;—বিবেকের ধ্বনি ভিন্ন আর কাহারও স্বর কর্ণে প্রবেশ করিতে দিবেন না; বিবেচনা শক্তি ভিন্ন আর

কাহারও পরামর্শ শুনিবেন না। শিক্ষা ও জ্ঞান উপার্জ্জন এ পথের সহায়
দেশের উপকার এ পথের পরিণাম ; এই গুরুতর ব্রত সর্ব্বদা স্মৃতিতে আ
করিয়া অগ্রসর হউন ;—ভবিষ্যতে উন্নতি বই অবনতি হইবে না।

সমাপ্ত।